৭৭

রুশ বিপ্লবের ইতিহাস

রুশ বিপ্লবের ইতিহাস

[রাশিয়ার প্রাচীন আমল থেকে নভেম্বর বিপ্লব
পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস]

শ্রীইন্দু ভূষণ দাস

পরিবেশক

এন ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং

১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশকঃ
দিলীপ চক্রবর্ত্তী

১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ—৩০ শে মার্চ ১৯৭৮
—১৫ই চৈত্র ১৩৮৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—১০ই মার্চ ১৯৮৯

প্রচ্ছদঃ
পূর্ণেন্দু রায়

মুদ্রাকর ঃ
গৌতম প্রিণ্টার্স
৬৩।এ।৩ হরি ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

মূল্য—বার টাকা

ভূমিকা

রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস পূর্বাপর সম্বন্ধে কোনো বাংলা বই না থাকায় বাংলা ভাষাভাষী লক্ষ লক্ষ মানুষ এ সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছু জানেন না। অথচ পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের (নভেম্বর বিপ্লবের) ইতিহাস জানবার ইচ্ছা রয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের ; বিশেষ করে যে সব তরুণ-তরুণী মার্কসবাদী পার্টিগুলির পতকাতলে সমাবেত হয়েছে। এই কারণে রুশ-বিপ্লবের একটি প্রামাণ্য ও তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করবার ইচ্ছা বহুদিন থেকে আমি পোষণ করতাম। কিন্তু প্রয়োজনীয় রেফারেন্স বই-এর অভাবে লেখার কাজে হাত দিতে পারছিলাম না।

আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই 'নভেম্বর বিপ্লব দিবস' পালিত হয় এবং সে সম্বন্ধে কিছু কিছু রচনাও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলি থেকে রুশ বিপ্লবের ইতিহাস লেখা যায় না। রুশ-বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে হলে রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, রোমানফ্ রাজবংশে-র অভ্যুদয়, উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত এবং বিপ্লব-প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে ইতিহাস-নির্ভর তথ্যাদি সন্নিবেশ করা দরকার। বিশাল রুশ দেশের ইতিহাসও বিরাট।। সেই বিরাট ইহিহাসের বেলাভূমি থেকে উপলখণ্ড সংগ্রহ করে তা থেকে বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যাবলী ধারাবাহিকভাবে সন্নিবেশ করতে না পারলে রুশ-বিপ্লব তথা নভেম্বর বিপ্লবের ইতিহাস তথ্য-নির্ভর হবে না। আমি তাই দীর্ঘ দিনের চেষ্টায় রাশিয়া সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ সংগ্রহ করে বর্তমান পুস্তকটি রচনা করেছি।

কতটা সফল হয়েছি, অথবা আদৌ সফল হতে পেরেছি কিনা সে কথা বিচারের ভার সুধী সমাজের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইতি—

শ্রীইন্দু ভূষণ দাস

Rush Biplaber Etihas
[A Historicai Litarature]
Written by
Sri Indu Bhusahan Das
Price Rs. 5 /-

প্রথম পরিচ্ছেদ

রুশবিপ্লবের পটভূমি

রুশ-বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই বলা দরকার বিপ্লবের পটভূমির কথা। এই পটভূমি তৈরী হয়েছে ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিক থেকে। অবিশ্যি তার আগেও কিছু কিছু বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে এখানে-ওখানে। কিন্তু সেগুলোকে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব-প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যায় না। সেগুলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই রাশিয়ার জনসাধারণ, বিশেষ করে কৃষকগণ জমিদার ও শাসকশ্রেণীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সজ্ঘবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল। শাসক ও শোষকদের অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে উঠেছে তখনই তারা বিদ্রোহী হয়ে অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয়েছে। সময় সময় তারা হিংসার পথেও পা দিয়েছে। অত্যাচার যখন সীমা ছাড়িয়ে গেছে তখনই কৃষকরা প্রতিহিংসা-পরায়ণ হয়ে উঠেছে। কৃষকদের এই প্রতিহিংসার আগুন রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে জ্বলে উঠেছে বিভিন্ন সময়ে।

কিন্তু এই অত্যাচার ও প্রতিরোধের কথা জানতে হলে রুশ সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তনের কাহিনী আগে জানা দরকার। আমরা তাই প্রথমে রুশ সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তনের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

রুশ সাম্রাজ্যের গোড়া-পত্তন ঃ

খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগে অথবা তার কাছাকাছি কোনো সময়ে রুরিক নামে একজন সুইডিস সর্দার উত্তর রাশিয়ার কিছু অঞ্চল অধিকার করে নেন। সুযোগ বুঝে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজা ওলেগ-ও কিছু অঞ্চল কুক্ষিগত করেন। এঁরা রাশিয়ায় রাজ্যস্থাপন না করলেও এঁদের অধিকৃত অঞ্চলসমূহে সুইডিস এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয় সভ্যতা প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং সুইডিস ও

স্ক্যাণ্ডিনেভিয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসে রাশিয়ার উত্তর অঞ্চলের জনসাধারণ কিছুটা আলোকের সন্ধান পায়।

এবার দক্ষিণ রাশিয়ার কথা বলছি। উত্তর রাশিয়ায় যখন সুইডিস ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয় সভ্যতা বিস্তারলাভ করেছিল, সেই সময় দক্ষিণ রাশিয়ায় বিস্তার লাভ করছিল গ্রীক সভ্যতা। কৃষ্ণ সাগরের (Black Sea) তীরবর্তী অঞ্চলসমূহেই গ্রীক সভ্যতা বেশী করে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু ওখানে গ্রীক সভ্যতা প্রসার লাভ করলেও, গ্রীকরা ওই অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করতে চেষ্টা করেনি।

রাশিয়ায় তখন সুগঠিত কোনো সরকার ছিল না। রুশ-সাম্রাজ্য তখন ছিল কল্পনার বস্তু। দীর্ঘকাল এইভাবে চলবার পর অবশেষে তৃতীয় আইভান (Ivan III) রাশিয়া থেকে বিদেশী দখলদারদের বিতাড়িত করে রুশ সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন করেন। শেষদিকে তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর মেরুসাগর থেকে কৃষ্ণসাগর এবং পোল্যাণ্ড থেকে ব্লাডিভস্টক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। অতএব বলা চলে যে, তৃতীয় আইভানই ছিলেন রাশিয়ার প্রথম সম্রাট (জার)। বংশানুক্রমে সিংহাসন লাভের প্রথাও তখন থেকেই চালু হয়।

রাশিয়ার তৎকালীন রাজনীতিঃ

প্রত্যেক দেশের রাজনীতিই সে দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের ওপরে নির্ভরশীল। অপর কথায়, দেশের ভৌগোলিক অবস্থান তার রাজনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাশিয়াতেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় নি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়ায় তখনও ইয়োরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করে নি। সুতরাং ইয়োরোপের মানুষদের চোখে রাশিয়া তখন অন্ধকারের দেশ বলে বিবেচিত হতো। রাশিয়ায় ইয়োরোপীয় সভ্যতা প্রবেশ করতে না পারার কারণ হলো যোগাযোগের অভাব। রাশিয়ার নিজস্ব কোনো সমুদ্র-বন্দর না থাকার ফলেই ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। উত্তর মেরুসাগর সব সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকায় এবং কৃষ্ণসাগর

(Black Sea) রাশিয়ার চিরশত্রু তুরস্কের অধিকারে থাকায় ওই দুটি সমুদ্রে বন্দর স্থাপন করা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাল্টিক সাগরে বন্দর স্থাপন করাও সম্ভব ছিল না; কারণ ওই সমুদ্রটি ছিল নরওয়ে, সুইডেন এবং ডেনমার্কের অধিকারে। রাশিয়ার পক্ষে তখন সমুদ্রবন্দর স্থাপনের উপযোগী একমাত্র যে স্থানটি ছিল তা হলো প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী ব্লাডিভস্টক নামক জায়গাটা। কিন্তু ব্লাডিভস্টক রাশিয়ার রাজধানী হ'তে (অর্থাৎ মস্কো হ'তে) প্রায় পাঁচ হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বলে ওখানে সমুদ্র-বন্দর স্থাপন করতে রাশিয়া আদৌ আগ্রহান্বিত ছিল না।

নিজস্ব সমুদ্র-বন্দর না থাকলে কোনো দেশই উন্নত হতে পারে না; তাছাড়া বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনও তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এই কারণেই, আয়তনের দিক থেকে বিশাল হলেও রাশিয়া অন্যান্য দেশের মতো উন্নত হতে পারেনি। তবে এই অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে জার পিটার-এর আমলে।

পিটারের রাজত্বকালে রাশিয়ার উন্নতি ঃ

রাশিয়ার উন্নতি শুরু হয় পিটারের রাজত্বকালে। তিনিই সর্বপ্রথম রাশিয়াকে অন্ধকার থেকে সভ্যতার আলোকে নিয়ে আসেন। পিটার ছিলেন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন শাসক। তাছাড়া তিনি তাঁর পূর্ববর্তী জারদের মতো কূপমণ্ডুক হয়ে থাকতে চাননি। তিনি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের সভ্যতার সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করেছিলেন। এবং নিজ অভিজ্ঞতা থেকে সেই সব দেশের ভাল ভাল প্রথাকে নিজের দেশে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে পিটারই রাশিয়ার জনসাধারণের মন হতে বহুবিধ কুসংস্কার দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পিটারের রাষ্ট্রসভা, মন্ত্রীসভা, সেনেট এবং বিচার বিভাগ ছিল। অর্থাৎ অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশে যা যা ছিল, রাশিয়াতেও সেই সেই ব্যবস্থার তিনি পত্তন করেছিলেন। কিন্তু বাইরের ঠাট অন্যান্য দেশের মতো হলেও ইয়োরোপীয়

দেশগুলির মতো রাশিয়ার জনগণের কোনো রকম নাগরিক অধিকার ছিল না। ওখানে জারের আদেশই ছিল আইন। জারের কথার ওপরে কথা বলবার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি রাষ্ট্রসভা, মন্ত্রীসভা, সেনেট এবং বিচার বিভাগও জারের অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হতো। ওইসব সংস্থার সদস্যরা নতমস্তকে জারের আদেশ পালন ক'রে চলতেন। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া তখন শাসিত হতো আমলাতন্ত্রের দ্বারা। আমলারা তাদের কাজের জন্যে একমাত্র জার ছাড়া আর কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিল না। এর ফলে তারা হয়ে উঠেছিল অত্যাচারী। তাদের অত্যাচারে জনসাধারণ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তো। জারের কাছে অভিযোগ জানাবার সুযোগও তাদের ছিল না। ফলে, তারা মুখ বুজে অত্যাচার সইতে বাধ্য হতো।

পিটার নিজে কিন্তু অত্যাচারী ছিলেন না। জনগণের উন্নতি হোক, এটাই তিনি চাইতেন। কিন্তু ক্ষমতার মোহ তাঁকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, তিনি মনে করতেন, তিনি যা করছেন তার সবকিছুই দেশের ও দশের ভালর জন্যেই করছেন। তাঁর আত্মম্ভরিতাও ছিল গগনস্পর্শী। তিনি সদম্ভে বলতেন যে, তাঁর কাজের জন্যে একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কারো কাছে তিনি জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নন।

পিটারের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হলো মস্কো থেকে রাজধানীকে সেণ্টপিটার্সবুর্স-এ স্থানান্তরণ।

বিপ্লব প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঃ

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, পিটারের আমল থেকেই রাশিয়ার জনগণের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জেগে উঠেছিল। কিন্তু এ অভিমতের স্বপক্ষে কোনো রকম সমর্থন পাওয়া যায় না। রাশিয়ার জনগণ ঠিক কখন থেকে বিপ্লবী মনোভাবপন্ন হয়ে উঠেছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকেই রাশিয়ায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার সূত্রপাত

হয়েছিল। শাসক শ্রেণী এবং তাদের দালালদের অত্যাচার যখনই সীমা ছাড়িয়ে যেতো তখনই বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তারা তখন জারের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে সরকারী কর্মচারি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে দাঙ্গা-দাঙ্গামা শুরু করতো।

এইসব দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে কৃষকরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করতো। জমিদারদের অত্যাচারের জন্যেই তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। উল্লেখযোগ্য যে, জারের সেনাবাহিনী সব সময়ই জমিদারদের পক্ষে দাঁড়াতো। জমিদাররা অভিযোগ করলেই কর্তৃপক্ষ তাদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী পাঠাতো।

স্টেঙ্ক রেজিনে কৃষক বিদ্রোহঃ

কৃষক বিদ্রোহ ব্যাপক আকারে দেখা দেয় ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে। স্টেঙ্ক রেজিন (Stenk Resin) অঞ্চলের কৃষকরা সরকারী কর্মচারি এবং জমিদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তারা গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই চালিয়ে জারের সেনাবাহিনীকে রীতিমত ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। কেউ কেউ বলেন যে, এই বিদ্রোহের নায়ক ছিল একজন দস্যু-সর্দার। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলেন যে, রাষ্ট্র-শক্তির বিরুদ্ধে জনগণের এই সংগ্রাম যত ক্ষুদ্র এবং যত সাধারণই হোক না কেন, একে অবশ্যই বিপ্লব প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা যায়। বলাবাহুল্য সরকার এই বিদ্রোহ সহজেই দমন করেন।

ফারগুচেক-এর বিদ্রোহঃ

স্টেঙ্ক রেজিনের কৃষক-বিদ্রোহ দমিত হলেও তার তিন বছর পরে ফারগুচেক নামক স্থানে আবার একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহ স্টেঙ্ক রেজিনের বিদ্রোহের চেয়েও ব্যাপক হয়েছিল। এখানকার কৃষকরা জারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু এদের এই বিদ্রোহ জরের স্বেচ্ছাচারের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে হয়নি। এটা হয়েছিল জাল তৃতীয় পিটারকে রাশিয়ার সিংহাসনে বসাবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং এই বিদ্রোহকে বিপ্লব-প্রচেষ্টা বলা চলে না।

রাশিয়ার তৎকালীন অবস্থা ঃ

এই সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সময় সময় সৈনিকদের ভেতরেও বিদ্রোহ দেখা দিতো। জার দ্বিতীয় ক্যাথারাইনের রাজত্বকালে কিছু সংখ্যক কসাক সৈনিক বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু জার সে বিদ্রোহ সহজেই দমন করেছিলেন।

পোল্যাণ্ডের অধিবাসীরাও মাঝে মাঝে জারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠতো। রাশিয়া জোর করে পোল্যাণ্ড দখল করে নিয়েছিল বলেই পোল্যাণ্ডের দেশপ্রেমিক মানুষরা সুযোগ পেলেই জারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতো। পোল্যাণ্ডবাসীদের এই বিদ্রোহ যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লব প্রচেষ্টা তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায় যে, বিপ্লব বা বিপ্লব-প্রচেষ্টা বলতে যা বুঝায়, এটা ঠিক তা ছিল না।

সামরিক কর্মচারিদের বিদ্রোহ ঃ

এরপর ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার কতিপয় উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারি ফ্রান্স ও জার্মানী হতে স্বদেশে ফিরে আসেন। বিদেশে থাকাকালে ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলী এবং নেপোলিয়নের বীরত্ব তাঁদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ফ্রান্স এবং জার্মানীর সঙ্গে নিজেদের দেশের তুলনা করে এঁরা ভীষণ ভাবে মর্মাহত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরা তাই স্বদেশে ফিরে এসেই সরকারী ও বেসরকারী স্তরের দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে কৃতসংকল্প হয়ে গোপনে গোপনে প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হতে বেশী দিন লাগলো না। ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে (১৪ই ডিসেম্বর) এঁরা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে সেণ্টপিটার্সবুর্গ-এ বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দেন। কিন্তু প্রথম দিকে কিছুটা সাফল্য লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সুষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবের জন্যেই এরকম হয়েছিল। সৈনিকেরা যখন নেতাদের নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা

করছে সেই সময় নেতারা 'এর পর কি করা যায়'—এই আলোচনাতেই সময় ব্যায় করতে থাকেন। ইতিমধ্যে সেণ্টপিটার্সবুর্গ-এর বাইরে জারের যেসব সেনাবাহিনী ছিল, জারের আদেশে তারা রাজধানীতে এসে বিদ্রোহীদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করে ফেলে। নেতারা সবাই ধরা পড়েন। বিচারে তাঁদের ছয় জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং অন্যান্যদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়।

এইভাবেই রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

বিপ্লব প্রচেষ্টার দ্বিতীয় স্তর ঃ

ডিসেম্বরের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর দীর্ঘদিন আর কোনো বিপ্লব-প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। তবে বাইরে থেকে দেখা না গেলেও ভেতরে ভেতরে আগুন ধিকি ধিকি জলছিল। এই আগুন আবার জলে উঠলো ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়। রাশিয়ার ভেতরে তখন যে সব বিপ্লবী গোপনে গোপনে কাজ ক'রে চলেছিলেন, তাঁরা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মিলিত বাহিনীর হাতে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় বিপ্লবীদের মনে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, তাঁরা জারের ওপরে ভীষণভাবে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। শুধু বিপ্লবীরাই নন, এই পরাজয়ে সমগ্র রুশ জাতিই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সেবাস্তপোলের পতন রাশিয়ার জনসাধারণের চোখ খুলে দেয়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, জার এবং তাঁর সেনাবাহিনী নিরস্ত্র দেশবাসীর ওপরে বিক্রম দেখাতে 'সিংহ অবতার' হলেও বিদেশী শত্রুর সামনে তারা মূষিকের চেয়েও অধম। জার-সাম্রাজ্যের ভিত্তি যে কত দুর্বল সে কথাও জনসাধারণ বুঝতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে জারও বুঝতে পারেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা ছাড়া ইয়োরোপীয় শক্তিসমূহের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তবে এটা তিনি বুঝতে পারলেন ইংল্যাণ্ড আর ফ্রান্সের হাতে নাজেহাল হবার পর। এইভাবে ঠেকে শেখার ফলে জার তাঁর প্রজাদের প্রতি কিছুটা উদার মনোভাব অবলম্বন করতে

বাধ্য হলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী শাসকরা পারতপক্ষে তাঁদের ক্ষমতা হস্তচ্যুত করতে চায় না। নিতান্ত বে-কায়দায় পড়লে তারা সংস্কারের নামে কিছু কিছু জোড়াতালি দিয়ে জনসাধারণকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন। (আমাদের এই ভারতবর্ষ যখন ইংরেজের অধীনে ছিল তখন ইংরেজ শাসকরাও ঠিক এইভাবে বার বার আমাদের ধোকা দিয়েছে—লেখক)।

যাই হোক, এবার সংস্কার এবং সংস্কারের চেষ্টা সম্বন্ধে কিছু বলছি।

জারের সংস্কার প্রচেষ্টা ঃ

রাশিয়ার তখন যতগুলি সমস্যা ছিল তার মধ্যে কৃষক-সমস্যাই ছিল প্রধানতম। শত শত বছরের শোষনের ফলে রাশিয়ার কৃষক সম্প্রদায় তখন দুর্গতির চরম সীমায় এসে পৌছেছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা তখন ভূমিদাসে পরিনত হয়ে জমিদারের ক্রীতদাস রূপে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছিলো। জমির উপর তাদের কোনো অধিকার ছিল না। যে সব জমি তারা চাষ করতো সে সব জমি ছেড়ে তারা যাতে অন্য কোনো জমি চাষ করতে না পারে তার জন্যে সরকার আইনের নামে জমিদার শ্রেণীর রক্ষকের ভূমিকা গ্রহন করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সরকার এক আইন জারী করে ভূমিদাস প্রথাকে আইন-সঙ্গত করে। ফলে কৃষকরা জমিদারের জীবন্ত সম্পত্তি হিসাবে পরিনত হয়। এই প্রথাটি এমন ভয়াবহ যে, কৃষকরা অসহায়ভাবে জমিদারের অত্যাচার সহ্য করে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হতো। তারা আধ-পেটা খেয়ে জমিদারের সিন্দুকে টাকা তুলে দিতো আর জমিদাররা তাদেরই শ্রমবদ্ধ অর্থে স্ফীতোদর হয়ে তাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতো। এই ভয়াবহ অত্যাচারের হাত থেকে একমাত্র কসাক সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ নিষ্কৃতি পায় নি। কসাকরাও যে খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিল তা নয়, তবে তারা যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিদ্রোহ দমনের কাজে তাদের ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জারের পক্ষে যুদ্ধ করতো বলে এ ব্যাপারে তারা কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করতো। (রুশ-সাম্রাজ্যে

কসাকদের অবস্থার কথা মিখাইল শোলোকভ তাঁর লেখা 'And Quiet Fiows the Don' নামক বিখ্যাত উপন্যাসে চমৎকার ভাবে বর্ণনা করেছেন। পাঠক-পাঠিকা ইচ্ছে করলে সে বইয়ের বাংলা অনুবাদ 'ডন নদীর গতিপথে' অথবা 'ধীরে বহে দন' পড়তে পারেন)।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ করবার পর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার তৎকালীন জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার 'ভূমিদাস প্রথা' রহিত করে এক ঘোষণাবাণী জারী করেন। জারের এই ঘোষণার ফলে জমিদাররা মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা জারের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে।

জমিদারদের বিরোধীতা ও জারের নতিস্বীকার ঃ

জমিদারদের সেই বিরোধীতা এমনই প্রবল আকার ধারণ করে যে, জার রীতিমত ভীত হয়ে ওঠেন। তিনি তখন পড়ে যান দোটানা অবস্থায়। জমিদার শ্রেণীর বিরোধীতা তিনি চান নি, আবার 'ভূমিদাস প্রথা' উচ্ছেদ করবেন বলে তিনি যে ঘোষণাবাণী জারী করেছেন তা থেকে পিছিয়ে আসাও তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে ছয় বছর যাবৎ নানা রকম টালবাহানা ও শলা-পরামর্শ করে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ এমন এক আইন জারী করা হয় যার ফলে হতভাগ্য ভূমিদাসদের কোনোই সুবিধে হয় না। আইনে এমন সব ফাঁক রেখে দেওয়া হয় যা জমিদারদেরই পক্ষে যায়। আইনে বলা হয় যে, ভূমিদাসরা যে পরিমান জমি চাষ করে সেই পরিমান জমির মালিকানা তাদের দিতে হবে। তবে কোথায় কোথায় তা দিতে হবে অথবা কোন্ কোন্ জমির মালিকানা তাদের দিতে হবে সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় না। আইনের বয়ান দেখে জমিদাররা খুশি হয়। তারা তখন এমনভাবে কৃষকদের জমি দেয় যাতে তাদের পক্ষে সে সব জমি চাষ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। জিনিসটা কিভাবে করা হয়েছিল তার একটা নমুনা এখানে দেওয়া হচ্ছে। মনে করা যাক কোনো একজন ভূমিদাসকে পাঁচ হেকটর জমি দেওয়া হবে। কিন্তু সে জমি কিভাবে দেওয়া হবে তা জমিদারই ঠিক করবে। ফলে সে একফালি জমি এখানে, আর

এক ফালি পাঁচ সাত মাইল পূবে, আর এক ফালি দশ মাইল দক্ষিণে—এইভাবে সেই কৃষককে জমি দেওয়া হলো। ফলে সে সব জমি আবার জমিদারদের হাতেই ফিরে এলো এবং কৃষকরা সর্বস্বান্ত হয়ে পথে দাঁড়ালো।

এই লোক-দেখানো ভূমি-সংস্কারের ফল ফলতেও দেরী হলো না। কৃষকরা যখন বুঝতে পারলো যে, আইনের নামে তাদের ধোকা দেওয়া হয়েছে তখন তাদের মনে জেগে উঠলো লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি। এবং এই প্রবৃত্তির ফলে রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় কৃষকেরা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষকদের সেই বিদ্রোহ শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না, রাশিয়ার ছাত্র-সমাজও এসে কৃষকদের সঙ্গে হাত মেলালো। শুধু তাই নয়, বিপ্লবী নেতারাও গোপনে গোপনে তাদের মদত দিতে লাগলেন। ফলে, সারা রাশিয়া জুড়ে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল।

বিপ্লবী নেতাদের বিদ্রোহে মদত দেবার কথা জারের কর্ণগোচর হতেও দেরী হলো না। তিনি তখন বিপ্লবী নেতাদের গ্রেপ্তার করবার জন্যে পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন।

বিপ্লবী নেতারা তখন গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে রাশিয়া হতে পলায়ন করে জুরিখে আশ্রয় গ্রহন করলেন এবং সেখান থেকেই বিপ্লবী কজকর্ম চালাতে লাগলেন। জুরিখ থেকেই তাঁরা রাশিয়ার ছাত্র-সমাজ এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াতে লাগলেন।

এর ফলে মস্কো ও সেণ্টপিটার্সবুর্গে ছাত্ররা বিদ্রোহী হয়ে পর পর কতকগুলো দাঙ্গা-হাঙ্গামা ঘটায়। সে সব দাঙ্গা-হাঙ্গামা অচিরেই দমিত হলেও ছাত্রসমাজ এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে বিপ্লবী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল সে মনোভাব ক্রমশঃ বেড়েই যেতে লাগলো। বিপ্লবীরাও নানা পথে এবং নানা উপায়ে এদের মনের সেই চাপা আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে যেতে লাগলেন। এর ফলে রাশিয়ার অভ্যন্তরেও এক শ্রেণীর শিক্ষিত যুবক বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মনে-প্রাণে বিপ্লবী হয়ে উঠলেন। আবার কিছুসংখ্যক যুবকের মধ্যে

সন্ত্রাসবাদী মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এঁদের মধ্যে কারকোসফ নামে একজন যুবক ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন।

কারকোসফ-এর এই কাজের ফলে জার একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তখন প্রচণ্ড আক্রোশে বিপ্লবীদের ওপর দমননীতি প্রয়োগ করলেন। পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর হাতে এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দেওয়া হলো যাতে যে কোনো লোককে গ্রেপ্তার করতে অথবা হত্যা করতে কোনো বাধা রইল না। তারাও বসংবদ ভৃত্যের মতো জারের হুকুম পালন করতে লেগে গেল। ফলে সারা রাশিয়া জুড়ে এক বীভৎস তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল।

এদিকে বিপ্লবীরাও চুপ করে রইলেন না। জারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরাও প্রতিরোধ শুরু করলেন এবং সুযোগ পেলেই পুলিশ কর্মচারি ও সেনাবিভাগের অফিসারদের হত্যা করতে লাগলেন।

বিপ্লবীদের এই সন্ত্রাসবাদের ফলে জার প্রচণ্ড আক্রোশে ফেটে পড়লেন। তিনি তখন পুলিশ আর সেনাবাহিনীর অফিসারদের নির্দেশ দিলেন, যেমন করেই হোক, বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। জারের এই আদেশের ফলে সারা দেশ জুড়ে ধর-পাকড় শুরু হলো। এর পরেই শুরু হলো বিচারের প্রহসন। সেই প্রহসনের ফলে বহু যুবক দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হলেন। সোইবেরিয়ায় বিপ্লবীদের নিদারুন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হতো। যেখান থেকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে কিভাবে তাঁরা পালিয়ে আসতেন সে কথা ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' বইতে দেখতে পাওয়া যায়।

গুপ্ত সমিতির প্রসার ঃ

পূর্বোক্ত ঘটনার পর থেকেই রাশিয়ায় একের পর এক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠতে থাকে। বিপ্লবীরা বুঝতে পারেন যে, প্রকাশ্যভাবে জারের বিরুদ্ধাচরন করতে গেলেই প্রাণদণ্ড অথবা নির্বাসন দণ্ড দিয়ে জার তাঁদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চাইবেন। সুতরাং তাঁরা বেছে নিলেন গোপন আন্দোলনের পথ।

কিন্তু কোনো কোনো সমিতি প্রকাশ্যেই বিপ্লববাদ প্রচার করতে শুরু করে। এই রকম একটি সমিতির নাম ছিল 'ল্যাণ্ড অ্যাণ্ড লিবার্টি পার্টি'। এই সমিতির নেতারা প্রকাশ্যেই বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করতে থাকেন। শুধু প্রচার করেই তাঁরা নিরস্ত থাকেন নি, প্রতিক্রিয়াশীল অফিসারদের হত্যা করার পরিকল্পনাও তাঁরা গ্রহন করেন। এর ফলে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতির সদস্য স্টেপনিয়ক প্রকাশ্য দিবালোকে রাশিয়ার গুপ্তচর বিভাগের প্রধান কর্মকর্তাকে হত্যা করেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ধর-পাকড়। কিন্তু স্টেপনিয়ক পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আর একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। এবারের হত্যকাণ্ডে যিনি প্রাণ দেন তিনি হলেন খারকভের গভর্নর প্রিন্স ক্রোপট্‌কিন। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ আরও চলতে থাকে। কিন্তু এই সব সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া কলাপের ফলে জনসাধারণকে দলে টেনে আনবার কাজ ব্যাহত হয়। জনসাধারণ ভয় পেয়ে বিপ্লবীদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে, তবে এতে যে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা নয়। বিপ্লবী যুবকদের সাহসিকতাপূর্ণ কাজকর্ম দেখে কতিপয় শিক্ষিত যুবক বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহন করেন। কিন্তু জনগণের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা এবং বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা ভলোভাবে প্রচারিত না হওয়ার ফলেই তারা শত যোজন দূরে সরে যায়।

চেইকোভস্কির আত্মানুশীলন সমিতি ঃ

বিপ্লবীরা যখন সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছেন সেই সময় চেইকেভস্কি নামে একজন চিন্তাবিদ একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিকে বলা হয় 'চেই-কোভস্কি চক্র'। প্রথম দিকে এই সমিতি আত্মোন্নতি ও আত্মানুশীলনের কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কি পরবর্তী কালে এই সমিতির সদস্যরা মহামতি বাকুনিনের সংস্পর্শে এসে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহন করেন এবং কায়মনোবাক্যে বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

সন্ত্রাশবাদীদের দ্বারা জার নিহত ঃ

রাশিয়ায় তখন বিভিন্ন বিপ্লবী দলের মধ্যে বিশেষ কোনো যোগাযোগ ছিল না। চেইকোভস্কি চক্রের সদস্যরা অনেকগুলি বিপ্লবী দলকে একতাবদ্ধ করেন এবং শিক্ষিত মধ্যেবিত্ত শ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। শ্রমিকদের মধ্যেও এই চক্রের সদস্যরা কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু তখনও এমন কতকগুলি দল ছিল, যে দলগুলি সন্ত্রাসবাদকেই প্রাধাণ্য দিতো। এই সব দলের সদস্যরা তখনও সন্ত্রাসবাদ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছিলো। এরা পাঁচ বার জারকে হত্যা করার চেষ্টা করে কিন্তু পাঁচ বারই জার দৈবক্রমে বেঁচে যান। সন্ত্রাসবাদীদের এই কাজের ফলে আবার শুরু হয় নির্বিচারে গ্রেপ্তার। বিচার শুরু হতেও দেরী হয় না। বিচারে ছাব্বিশ জন বিপ্লবীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু সরকারী দমননীতি বিপ্লবীদের দৃঢ় সংকল্পকে স্তব্ধ করতে পারে না। জারকে হত্যা করতে তারা কৃতসংকল্প। ফলে আর একবার বিফল প্রচেষ্টার পরে সপ্তমবারে তারা সফল হয়। গ্রীনোভিটাস্কি নামে একজন বিপ্লবী যুবক বোমার দ্বারা জারকে হত্যা করেন।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে রাশিয়ার বুকে যে নিষ্ঠুর দমন-পীড়ণ চালানো হয় তার তুলনা নেই। শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিলো তাও বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার সিংহাসনে বসেই ঘোষণা করেন, রাশিয়ায় আর কোনোরকম সংস্কার প্রবর্তন করা হবে না। জনসাধারণের ব্যক্তিগত জীবনে যে সামান্যতম স্বাধীনতা ছিলো তাও শেষ হয়ে গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বিপ্লবী-শক্তির প্রসার

পূর্ব পরিচ্ছেদে যে রাজকীয় ঘোষণার কথা বলা হয়েছে সেই ঘোষণাটি প্রচারিত হয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ। সেই রাজকীয় ঘোষণায় প্রতিবাদে বিপ্লবীরাও ওই দিনেই একটি ইস্তাহারে প্রচার করেন। ইস্তাহারে বলা হয় ঃ

"বৃথা রক্তপাত আমরাও চাই না। কিন্তু জার যদি জনসাধারণের দাবি পূরণ না করেন এবং দমননীতি প্রয়োগ করে তাদের স্তব্ধ করে রাখতে চান তাহলে সেই দাবি আদায় করবার জন্যে বিপ্লব অবশম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। জনসাধারণের দাবিগুলি হলো ঃ

(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে।

(২) জনসাধারণের ভেতর থেকে স্বাধীনভাবে নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নিয়ে একটি প্রতিনিধি-সভা গঠন করতে হবে। এই সভাই জনগণের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার কিরূপ হবে তা স্থির করবে।

(৩) স্বাধীন নির্বাচন-প্রথার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে যে সব বিষয় দিতে হবে তা হলো ঃ

(ক) বাক্-স্বাধীনতা ;

(খ) মুদ্রা-যন্ত্রের স্বাধীনতা ;

(গ) সভা ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা ;

(ঘ) জনসাধারণের ইচ্ছামতো বৃত্তি গ্রহনের অধিকার, এবং

(ঙ) খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার অধিকার।

এগুলি ছাড়া আরও কিছু মৌলিক অধিকার দাবি করা হলো সেই ইস্তাহারে। কিন্তু বিপ্লবীদের এই দাবিগুলিকে জার সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা

করলেন। তিনি তখন দেশে স্বেচ্ছাতন্ত্র চালাতে কৃতসংকল্প। জনসাধারণ যাতে ভবিষ্যতে আর কোনোদিন মাথা তুলতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে সরকারের শিক্ষা-বিভাগ থেকে একটি গোপনীয় সারকুলার জারী করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, এখন থেকে ভৃত্য, পাচক, ধোপা, নাপিত, মুদি, ঝাড়ুদার প্রভৃতির সন্তানরা কোনো দিনই উচ্চতর পদমর্যাদা লাভ করতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপরে গোপনে নজর রাখার কথাও বলা হলো সেই সারকুলারে।

এই অভাবনীয় সারকুলারটিতে সই করেছিলেন জার-সরকারের শিক্ষামন্ত্রী। এর ফলে, রাশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তখন থেকে পুলিশের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে লাগলো।

আইন-আদালতের অবস্থাও হলো 'তথৈবচ'। রাশিয়ার আদালতগুলি তখন জার সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পরিচালিত হতে লাগলো; ফলে বিচারকদের কোনোরকম স্বাধীনতাই রইলো না। তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই বিচারের প্রহসন চালাতে লাগলেন।

পৃথিবীর সব দেশেই জনসাধারণের অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রক্ষাকর্তা হলো আইন-আদালত, কিন্তু তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের আমলে রাশিয়ায় এর ব্যতিক্রম দেখা দেয়। ওখানে বিচারকের ক্ষমতার চেয়েও পুলিশের ক্ষমতাই ছিল বেশী। পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের অফিসারদের ইঙ্গিত অনুসারেই বিচারকরা বিচারের অভিনয় করতেন। পুলিশের হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যাকে অনভিপ্রেত মনে করতো তাকেই গ্রেপ্তার করে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠাতো। এই সব ব্যবস্থার ফলে ছাত্র-সমাজ এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের যুবকরা সরকারের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি গ্রহন করে।

ছাত্রসমাজের বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি ঃ

রাশিয়ার এই সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে,

সে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র এবং শিক্ষিত যুবক শ্রমিক ও কৃষকের ছদ্মবেশে বিভিন্ন কল-কারখানার এবং গ্রামাঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় গ্রহন করেছিলো। শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার করাই ছিলো তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছাত্রসমাজ এবং শিক্ষিত যুবকেরা তখন মহামতি বাকুনিনের নির্দেশ অনুসারে কাজ করতো। বাকুনিন তখন জুরিখে অবস্থান করছিলেন। সেখান থেকেই তিনি গোপনে রাশিয়ার ছাত্র ও শিক্ষিত যুবকদের কাছে তাঁদের করণীয় সম্বন্ধে নির্দেশ পাঠাতেন। ছাত্র ও যুবকরাও তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তাঁরা যে শ্রমিক ও কৃষকদের ছদ্মবেশে কল-কারখানার এবং গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাও সম্ভব হয়েছিল বাকুনিনের নির্দেশেই।

পুলিশের গুপ্তচর বিভাগও নিষ্ক্রিয় ছিল না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা জেনে ফেললো যে, বাকুনিনের নির্দেশেই ছাত্র-সমাজ এবং শিক্ষিত যুবকেরা বিপ্লবী কর্মপদ্ধতি গ্রহন করেছে। গুপ্তচর বিভাগ তখন ছাত্র-সমাজকে সায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে এক পরিকল্পনা গ্রহন করে। তারা সন্দেহভাজন ছাত্র নেতাদের বিপ্লবী ব'লে চিহ্নিত করে নানাভবে তাদের উপর নির্যাতন চালাতে থাকে।

পুলিশের এই অত্যাচার হতে অব্যাহতি লাভের জন্য শত শত ছাত্র রাশিয়া হতে পালিয়ে গিয়ে জুরিখে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেতেই গোপনে বিপ্লবী কাজকর্ম চালাতে থাকেন। তাঁদের সেই গোপন কাজের ফলে রাশিয়ার ছাত্র-সমাজ পুরোপুরিভাবে বিপ্লবী হয়ে উঠে।

ছাত্রদের বিপ্লবী কার্যকলাপ দেখে জার সরকার ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। সরকারী কর্তৃপক্ষের মনে তখন একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সরকারী বৃত্তি নিয়ে যে সব ছাত্র উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে বাস করছে তারা সবাই বিপ্লবী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ছে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিদেশ পাঠানো বন্ধ করলেন

এবং যাঁরা বিদেশে শিক্ষালাভ করছিলেন তাঁদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। এর ফলে প্রায় একশ ছাত্র বিদেশ থেকে রাশিয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই আবিমৃষ্যকারী কাজের ফল হলো বিপরীত। বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্ররা আগে থেকেই বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন ; কিন্তু বিদেশে থেকে তাঁরা এতদিন বিশেষ কিছু করতে পারছিলেন না। তাই দেশে ফিরে এসেই তাঁরা বিপ্লবী কাজকর্ম শুরু করে দিলেন। রাশিয়ার ছাত্র-সমাজ আগে থেকেই বিপ্লবী কর্মধারা গ্রহন করেছিলেন। এবার বিদেশ-প্রত্যাগত ছাত্ররা তাঁদের নেতৃত্ব গ্রহন করায় ছাত্রসমাজ রীতিমত সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আলেকজান্দার উলিয়ানভ্-এর প্রাণদণ্ড ঃ

রাশিয়ার বিপ্লবী ইতিহাসে আলেকজান্দার উলিয়ানভ-এর প্রাণদণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তিনি ছিলেন 'উইল অব দি পিপলস্ পার্টি' নামক একটি বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য। এই দলটি ছিলো বিপ্লবী ছাত্রদেরই একটি বিশেষ সংস্থা। অন্যান্য বিপ্লবী দলের মতো এই দলটিও জারকে হত্যা করবার পরিকল্পনা গ্রহন করেছিলো কিন্তু এই পরিকপ্লনার কথা কি করে যেন ফাঁস হয়ে যায়। পুলিসের গুপ্তচররা তখন গোপনে এই দলের সদস্যদের ওপর নজর রাখতে থাকে।

এর কিছুদিন পরে (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে) বিপ্লবীরা যখন বোমা নিয়ে সেণ্টপিটার্সবুর্গের একটি রাজপথের ধারে অপেক্ষা করছিলেন সেই সময় পুলিশের গুপ্তচররা অতর্কিতে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সবাইকে ধরে ফেলে। আলেকজান্দার উলিয়ানভও তাঁদের মধ্যে ছিলেন ; ফলে তিনিও ধরা পড়েন। এর পরই শুরু হয় বিচারের প্রহসন। বিচারে আলেকজাণ্ডার উলিয়ানভ সহ পাঁচজন যুবকের প্রাণদণ্ড হয়।

ইতিপূর্বে অনেক বিপ্লবী যুবকেরই প্রাণদণ্ড হয়েছে, কিন্তু তাঁদের কথা উল্লেখ না করে উলিয়ানভের কথা বিশেষ

ভাবে উল্লেখ করা হলো কেন, সে সম্বন্ধে হয়তো পাঠকদের মনে একটা প্রশ্ন উঠবে। এই সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে রাখছি যে, ইনি ছিলেন ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ালনভ্-এর (অর্থাৎ লেনিনের) বড়ো ভাই। আলেকজান্দারের যখন ফাঁসী হয় তখন লেলিন ছিলেন নিতান্তই বালক। মৃত্যু-সংবাদ যখন উলিয়ানভ পরিবারের কাছে পৌছালো তখন সমগ্র পরিবারের ওপরে নেমে এলো বিষাদের কালো ছায়া। কলহাস্য মুখরিত গৃহে অকস্মাৎ দেখা দিলো শ্মশানের নিস্তব্ধতা। আগেই বলেছি, লেনিনের বয়স তখন খুবই অল্প। কিন্তু বয়সে বালক হলেও দাদার মৃত্যু তাঁর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। তাঁর সরল মনে জগে উঠলো একটি মাত্র প্রশ্ন—"কেন ওরা দাদাকে হত্যা করলো?" এই 'কেন'-র উত্তর খুঁজতে গিয়ে বালক লেনিন জানতে পারলেন যে, দেশের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করবার জন্যেই তাঁর স্নেহময় দাদা মৃত্যু বরণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে আবার প্রশ্ন জাগলো,—"দেশের মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা কি এবং তার কারণই বা কি?"

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেনিনের চোখের সামনে থেকে যেন একটা কালো পর্দা সরে গেল। তিনি দেখতে পেলেন এক বীভৎস দৃশ্য! সেই দৃশ্য দেখে তিনি চমকে উঠে ভাবলেন—'এই কি আমার স্বদেশ—এই কি আমাদের সমাজ।'

এরপর ধীরে ধীরে তিনি সব কথাই বুঝতে পারলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মনটাও দাদার মতো বিপ্লবমুখী হয়ে উঠলো। এবং বাল্যকালের সেই চিন্তাধারাই পরবর্তীকালে তাঁকে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম নেতারূপে পরিণত করলো।

যাইহোক, লেনিনের কথা আমরা পরবর্তী একটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করবো। এখন আবার আমরা আগের কথায় ফিরে আসছি।

আলেকজান্দার উলিয়ানভ্ এবং তাঁর সহকর্মীরা জারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র কেন করেছিলেন সে কথা জানতে হলে আমাদের তৎকালীন রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার কথা জানা দরকার। রাশিয়ায় তখন এমন এক সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছিলো যে, কোনো ব্যক্তিই ছাড়-পত্র ছাড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গার যেতে পারতো না। কেউ ঘরের বাইরে ঘুমোলেও তা অপরাধ বলে গণ্য হতো। কোনো শহরে বা গ্রামে কোনো নতুন লোক এলে তাকে নিকটবর্তী থানায় গিয়ে তার আগমণের কারণ জানাতে হতো এবং যতোদিন সে সেখানে থাকতো ততোদিন প্রত্যহ নিয়মিতভাবে থানায় হাজিরা দিতে হতো। এছাড়া পুলিশ যে কোনো লোককে বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার করতে পারতো এবং যে কোনো বাড়িতে হানা দিয়ে খানাতল্লাস করতে পারতো। সংবাদপত্রগুলির কোনো স্বাধীনতা ছিল না। প্রকাশিতব্য সংবাদ এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য পূর্বাহ্নে সেন্সর বিভাগ থেকে সেন্সর করিয়ে নিতে হতো। সেন্সরের কবলে পড়ে বহু সংবাদ বিকৃত-অবস্থায় বের হতো। অনেক সংবাদ আদৌ বের হতো না সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। পুলিশ অফিসাররা সে সব সাহিত্য বুঝতে পারতো না, অথবা ভুল বুঝতো সে সব সাহিত্য বিখ্যাত লেখকদের রচিত হলেও রাশিয়ায় প্রবেশ করতে পারতো না। এর ওপর কারণে-অকারণে নির্যাতন আর পীড়ন তো অব্যাহতভাবেই চলছিলো। এইসব কারণেই যুবকশ্রেণী, বিশেষ করে ছাত্র-সমাজ জারের বিরোধী হয়ে পড়েছিলো।

শাসকের চণ্ডনীতির উদ্যত খড়্গ যখন জনসাধারণের মাথার ওপর ঝুলতে থাকে, তখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা সেখানে অন্তর্হিত হয়, এবং বৈধ আন্দোলনও অমার্জনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হয়ে থাকে। যেখানে এই রকম অবস্থা চলতে থাকে সেখানে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে আন্দোলনকারীদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে অথবা প্রচার কার্যের সুবিধে

হবে মনে করে সন্ত্রাসের পথে পা বাড়ায়। এরকম ঘটনা বহু দেশেই ঘটে থাকে। (আমাদের এই ভারতবর্ষেও বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম দিকে এই ধরনের ঘটনাই স্থান পেয়েছিলো—লেখক)। রাশিয়াতেও সেই অবস্থাই হয়েছিলো। কিন্তু এতো সব করেও জার-সরকার বিপ্লবীদের দমন করতে পারলো না। জনমতের স্বতস্ফূর্ত প্রকাশকে যখন জোর করে বন্ধ করা হয়, তখন গুপ্ত-পন্থা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। রাশিয়াতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। প্রকাশ্য প্রচারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিদেশ হতে নানা রকম বই ও সংবাদপত্র গুপ্তভাবে রাশিয়ায় আসতে থাকে।

নিষিদ্ধ বই ও পত্র-পত্রিকা ঃ

জার সরকারের আমলাদের চোখে এই সব বই ও পত্র-পত্রিকা বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হলেও আমালাতন্ত্র ওগুলির প্রবেশ বন্ধ করতে সক্ষম হলো না। কে বা কারা, কিভাবে, কোন্ পথে ওই সব বই ও পত্র-পত্রিকা রাশিয়ায় চালান দিতো এবং কে, কোন্ পথে সেগুলো আমদানি করে জনগণের কাছে বিলি করতো তা শত চেষ্টা করেও আমলারা জানতে পারতো না।

ওই সব বইতে থাকতো আগুন ছরানো লেখা আর পত্র-পত্রিকায় থাকতো জারের অত্যাচারের কাহিনী এবং আরও এমন সব খবর যা সরকারী সেন্সর বিভাগ কেটে দিতো। এটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ বই আর খবরের কাগজ প্রকাশ্যভাবে প্রকাশ করতে লেখক, প্রকাশক এবং সম্পাদকের যে দায়িত্ব থাকে, গুপ্তভাবে প্রকাশিত হলে তাদের সে রকম কোনো দায়িত্ব থাকে না। এর ফলে ওগুলি ভীষণ উত্তেজনামূলক প্রবন্ধাদিতে ঠাসা থাকতো।

গুপ্তপথে প্রচারিত এই সব বই, ইস্তাহার আর সংবাদপত্র রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের কিভাবে বিপ্লবী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করতো এবং কিভাবে সেগুলো প্রচারিত হতো তার কিছু কিছু বিবরণ গোর্কির 'মা' উপন্যাসে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাঠকরা ইচ্ছে করলে গোর্কির 'মা'-র বাংলা অনুবাদ পড়ে সে সব কথা জেনে নিতে পারবেন।

বিপ্লবী কর্মপদ্ধতির পরিবর্তন ঃ

'উইল অব দি পিপলস্ পার্টি'-র সদস্যদের ফাঁসী হবার পরে জার-সরকারের পুলিশ যেভাবে তাণ্ডব শুরু করে তার ফলে কিছু সংখ্যক বিপ্লবী তাঁদের কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। এঁরা মনে করেন, শুধু সন্ত্রাসবাদ দ্বারা জারের শাসনযন্ত্রকে অচল করা সম্ভব নয়। এঁরা আরও মনে করতেন যে, জনসাধারণের মনে রাজনৈতিক চেতনা ও বিপ্লবী ভাব জাগিয়ে তুলতে না পারলে রাশিয়ার বুক থেকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিষবৃক্ষকে উৎপাটিত করা যাবে না। এঁরা তাই এঁদের কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করলেন। এই পরিবর্তিত কর্মপদ্ধতি হলো সমাজতন্ত্রবাদ এবং এর প্রবক্তা হলেন সে আমলের বিখ্যাত সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদ প্লেখানভ। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, প্লেখানভের সমাজতন্ত্রবাদ কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডরিস অ্যাঙ্গোলস-এর সমাজতন্ত্রবাদ হতে আলাদা কিছু নয়।

বিপ্লবীরা সমাজতন্ত্রবাদকে তাঁদের রাজনৈতিক পথ বলে গ্রহণ করবার পরে আন্দোলন নতুন পথে প্রবাহিত হলো। শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হবার প্রয়োজন বুঝতে পেরে বিভিন্ন কাখানায় শ্রমিক সংঘ গঠিত হলো। মাঝে মাঝে দু-চারটে ধর্মঘটও হতে লাগলো। অন্যদিকে জেমস্টভের মাধ্যমে জনসাধারণের অভিমতও জারের কাছে পেশ করার প্রচেষ্টা শুরু হলো।

কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে এমন অনেক যুবক ছিলেন যাঁরা এই নিরামিশ পদ্ধতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তবুও 'দেখা যাক কি হয়' মনে করে এঁরা 'অপেক্ষা করা এবং লক্ষ্য করা পদ্ধতি' (wait and see policy) অবলম্বন করে কিছুদিনের মতো চুপ করে থাকবেন বলে স্থির করলেন।

জেমণ্ট্ভ্ বা জনগণের প্রতিনিধি-সভা ঃ

এবার জেমস্টভ সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। জার-সরকার এটাকে জনগণের প্রতিনিধি-সভা বলে আখ্যা দিলেও আসলে এটা

ছিলো কতিপয় 'জো-হুকুমের' সভা। এ সভার সদস্যরা জনগণের স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ করতো না। তাদের সদস্য করা হতো মনোনয়নের মাধ্যমে। এর ফলে জেমস্টভ্ জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করতে ভয় পেতো।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন জেমস্টভ-এর মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৬৭ জন ছিল জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি আর শতকরা ৩০ জন ছিল কৃষকদের প্রতিনিধি। এরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করতে পারতো না। এদের কাজ ছিলো রাস্তাঘাট নির্মাণ, সেচ ব্যবস্থা এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা। সুতরাং জেমস্টভ-এর মাধ্যমে জনসাধারণের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তুলে ধরার কোনো সুযোগই ছিলো না।

দ্বিতীয় নিকোলাস-এর আমল ঃ

তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার সিংহাসনে উপবেশন করেন। কিন্তু তিনিও তাঁর পূর্বসূরীদের মতোই স্বেচ্ছাতন্ত্র অনুসরণ করে চলবেন বলে ঘোষণা করেন। তিনি আরও জানান যে, তাঁর স্বর্গগত পিতা যে নীতিতে রাজ্য শাসন করে গেছেন, তিনি সেই নীতি থেকে এক চুলও নড়বেন না। তবে তিনি যে, একেবারেই স্বেচ্ছাচারী সম্রাট ছিলেন তা নয়। প্রজাদের ভালোর জন্যে কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধে দেবার কথাও তিনি মাঝে মাঝে বলতেন। কিন্তু তাঁর চারপাশে যেসব লোক সব সময় থাকতেন, সেই মন্ত্রীমণ্ডলী, সৈন্যাধ্যক্ষ, পুলিশ-প্রধান এবং বিভাগীয় প্রধানেরা অনবরত তাঁর কানে ফুসমন্তর দিয়ে অচিরেই তাঁকে স্বেচ্ছাচারী করে তুললেন।

এদিকে বিপ্লবীরাও মনে মনে আশা পোষণ করছিলেন যে, নতুন জার হয়তো জনসাধারণকে ছিছুটা সুযোগ-সুবিধে দেবেন। আগেই বলেছি যে, বিপ্লবীদের একটা বড়ো অংশ তখন wait and see policy অনুসরণ করে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু সাত বছর প্রতীক্ষা করার পরেও তাঁরা যখন

দেখলেন যে, জারের মতিগতির কোনো পরিবর্তনই হলো না, তখন তাঁরা আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না।

বিগত সাত বছর যাঁরা বৈধ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণের সামনে স্বর্গের সিঁড়ি এনে দেবেন বলে তারস্বরে বচনামৃত ছড়াচ্ছিলেন, সেই সমাজতন্ত্রীরা যখন কিছুই করতে পারলেন না, তখন তাঁদের জায়গা দখল করলেন সমাজ-বিপ্লবীদল (Social Revolutionaries)। তাঁরা আসরে অবতীর্ণ হয়েই পুনরায় গুপ্তহত্যার পথ অবলম্বন করলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিলো, আবেদন-নিবেদনে কিছু হবে না ; জারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে আদায় করতে হলে বোমা পিস্তল যথেচ্ছ ভাবে ব্যবহার করতে হবে। অতএব আবার শুরু হয়ে গেল সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ।

মেরী ডিয়েট্রফ-এর আত্মহত্যা ঃ

এই সময় (১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে) এমন একটি ঘটনা ঘটলো যার ফল হলো সুদূরপ্রসারী। আগেই বলেছি যে, নানা গুপ্তপথ দিয়ে নিষিদ্ধ বই আর পত্র-পত্রিকা রাশিয়ায় প্রবেশ করতো এবং সেগুলো গুপ্তভাবে জনসাধারণের কাছে বিলি করা হতো। এই রকম একটা নিষিদ্ধ পুস্তিকার বাণ্ডিল নিয়ে মেরী ডিয়েট্রফ্ নামে একজন ছাত্রী যখন সেণ্টপিটার্সবুর্গের একটি রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন সেই সময় পুলিশের গুপ্তচররা তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এরপর প্রায় সাত সপ্তাহ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। সাত সপ্তাহ পরে হঠাৎ একদিন জানা যায় যে, মেরী তাঁর পোষাকে কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

খবরটা প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেণ্টপিটার্সবুর্গের সাধারণ মানুষর ক্রোধে ফেটে পড়লো। তারা সন্দেহ করলো যে, বন্দী অবস্থায় মেরীর ওপরে অমানুষিক অত্যাচার চালানো হয়েছে এবং সেই অত্যাচারের ফলেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন। জনগণের সেই ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন জোগালেন বিপ্লবীরা। তাঁরা এক ইস্তাহার বের করে জনগণের মনে এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করে

দিলেন। জনসাধারণ তখন বিরাট শোভাযাত্রা করে কাজান গীর্জা অভিমুখে রওনা হলো। শোভাযাত্রীদের মুখে স্লোগান ধ্বনিত হলো—"অত্যাচারী জার নিপাত যাক!"

শোভাযাত্রীদের অগ্নিমূর্তি দেখে তাদের গতিরোধ করতে এগিয়ে এলো পুলিশ দল। কিন্তু জনতা তাদের গ্রাহ্য করলো না। প্রচণ্ড ক্রোধে মুহুর্মুহু স্লোগান দিতে দিতে তারা গীর্জার দিকে চলতে লাগলো। গীর্জার সামনে উপস্থিত হয়ে তারা নতজানু হয়ে মেরীর আত্মার শান্তির জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলো।

ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। সেণ্টপিটার্সবুর্গের সেই খবর দাবানলের মতো সারা রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়লো। রাশিয়ার জনসাধারণ তখন জারের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে যত্রতত্র তাঁর বাপান্ত করতে লাগলো। জনগণের সেই অগ্নিমূর্তি যেন আসন্ন ঝড়ের সংকেত বহন করে আনলো।

কাউণ্ট উইটির সুপরামর্শ ঃ

জনগণের হাব-ভাব এবং চাল-চলন লক্ষ্য করে জার-সরকারের অর্থমন্ত্রী কাউণ্ট উইটি বুঝতে পারলেন যে, তাদের যদি শান্ত করা না যায় তাহলে অবস্থাটা আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। তিনি তাই জারকে পরামর্শ দিলেন, অবিলম্বে জমসাধারণকে কিছু কিছু রাজনৈতিক অধিকার না দিলে অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে পড়বে। দেশ কোন্ পথে চলছে এবং তার পরিণতি কি হতে পারে সে কথাও তিনি জারকে বুঝাতে চেষ্টা করেন। জার কিন্তু কাউণ্ট উইটির এই সুপরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। জনসাধারণকে রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধে দেওয়াকে তিনি দুর্বলতার চিহ্ন বলে মনে করলেন। কিন্তু দেশের মানুষদের কাছে বিক্রম প্রকাশ করলেও শক্তিমান বিদেশীদের কাছে তিনি যে কত দুর্বল তা শীগ্‌গিরই দেখতে পাওয়া গেল। জারের সেনাবাহিনী যে দেশরক্ষায় অসমর্থ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল রুশ-জাপান যুদ্ধে জার-বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে।

জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ ঃ

দেশের মানুষের মনে যখন সরকার-বিরোধী মনোভাব জেগে উঠেছে, সেই সময় কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ায় রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত চলছিলো। এই বিরোধ যাতে বেশীদূর না গড়ায় তার জন্যে জারের তরফ থেকে চেষ্টা চলে। কিন্তু সে চেষ্টা আন্তরিক ছিলো না। জার মনে করতেন যে, ক্ষুদ্র জাপান বিরাট রাশিয়ার কাছে নিতান্তই নগণ্য। তিনি এবং তাঁর পরামর্শদাতারা তাই নিজের কোলে ঝোল টেনেই বিরোধ মেটাবার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু জোড়াতালি দিয়ে বিরোধ মেটাবার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া ও জাপান পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

সঙ্গে সঙ্গে 'সাজো সাজো' রব পড়ে গেল। জারের সেনাপতিরা তখন তাঁদের চতুরঙ্গ বাহিনী নিয়ে জাপানকে শায়েস্তা করতে ব্লাডিভস্টক অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁদের হয়তো ধারণা ছিল যে, জাপানী সেনাবাহিনী তাঁদের একটি মাত্র ফুৎকারেই উড়ে যাবে। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে দেখা গেল, জাপানীদের সঙ্গে রুশ-বাহিনী এঁটে উঠতে পারছে না। অবশেষে পরাজয়ের কালিমা মুখে মেখে রুশ-বাহিনী অধোমুখে রাজধানীতে ফিরে এলো।

ইতিপূর্বে ক্রিমিয়ার যুদ্ধেও রুশ-বাহিনী ঠিক এইভাবেই পরাজিত হয়েছিলো। সে যুদ্ধ যেভাবে জার-বাহিনীর দুর্বলতাকে জনগণের কাছে প্রকাশ করেছিলো, রুশ-জাপান যুদ্ধও সেইভাবেই দেখিয়ে দিলো যে, জারের বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি কত দুর্বল এবং কত শিথিল।

রুশ-বাহিনীর এই পরাজয় রাশিয়ার জনসাধারণের মনে নিদারুণভাবে আঘাত করে। জাপানের ওপরে তারা ক্রুদ্ধ হয় না, তারা ক্রুদ্ধ হয় জারের ওপরে। জনগণের মানসিক অবস্থা আগে থেকেই জারের বিরুদ্ধে ছিলো, রুশ-বাহিনীর পরাজয়ে তারা আর মনের অসন্তোষ এবং ক্রোধকে চেপে রাখতে পারলো না। তারা তখন গণ-বিপ্লবের পথে পা বাড়ালো। গণ-বিপ্লবের এই জয়-যাত্রার কথাই এরপর আমরা আলোচনা করবো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গণ-বিপ্লবের প্রথম স্তর

রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশ-বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় জারের পক্ষে রীতিমত মারাত্মক হয়ে দেখা দিলো। ক্ষুদ্র জাপান যে বিশাল রাশিয়াকে পরাজিত করতে পারবে, রাশিয়ার জনসাধারণ আগে তা কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু সেই অকল্পনীয় ব্যাপারটাই যখন সত্যি হয়ে দেখা দিলো তখন সারা রাশিয়ার ওপরে নেমে এলো অবসাদের কালো ছায়া। রুশ-বাসীর সম্মান নিয়ে জার যেভাবে ছেলেখেলা করে চলেছিলেন, জনগণ আর তা মেনে নিতে রাজী হলো না। তারা জার-সরকারের ক্ষমতার ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারলো না। তারা বুঝতে পারলো যে, জার এবং তাঁর আমলা-তন্ত্র শুধু নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপরে অত্যাচার করতেই পটু, দেশ-রক্ষা এবং বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে তারা একেবারেই অক্ষম।

জনসাধারণের মন যখন এইভাবে বিষিয়ে উঠেছে তখন ও কিন্তু জার-সরকারের চৈতন্যোদয় হয়নি। জার-সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্লেভে তখনও জনগণের প্রতি কোনোরকম ঔদার্য দেখাবার দরকার বোধ করেননি।

প্লেভের অবিমৃষ্যকারীতা ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী প্লেভে ছিলেন স্বেচ্ছাতন্ত্রের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। জারও তাঁর পরামর্শ মতো কাজ করতেন। ইতিপূর্বে অর্থমন্ত্রী কাউণ্ট উইটি জারকে যে সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, সে পরামর্শ অগ্রাহ্য করার মূলেও ছিল এই প্রতিক্রিয়াপন্থী প্লেভে। তাঁর পরামর্শেই জার তখন কাউণ্ট উইটির সুপরামর্শ গ্রহণ করেন নি। রুশ-জাপান যুদ্ধের পরেও তিনি জনগণের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, দুর্বিণীত জনসাধারণকে আচ্ছামতো পিটুনি দিলেই তাদের মন থেকে সরকার-বিরোধী মনোভাব দূর

হয়ে যাবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে জনগণের বুকের ওপর দিয়ে অত্যাচারের রথ চালিয়ে দিলেন। কিন্তু এর ফল হলো বিপরীত। অত্যাচারের ফলে জনসাধারণ সরকারের ওপর আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বিশাল রুশ-সাম্রাজ্যে সরকারী কর্মচারী ছাড়া জারের বন্ধু আর কেউ রইলো না। প্লেভের অত্যাচারে সমগ্র জাতি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলো।

বিপ্লবীরাও এসময় চুপ করে ছিলেন না। অত্যাচারী প্লেভেকে তাঁরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুলাই বিপ্লবীদের হাতে প্লেভে নিহত হলেন। এইভাবেই বিপ্লবীরা অত্যাচারের প্রতিশোধ নিলেন।

কিন্তু প্লেভে নিহত হলেও অত্যাচার বন্ধ হলো না। প্লেভের শূন্যস্থান পূর্ণ করবার জন্য আরও অনেকে এগিয়ে এলেন। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন প্লেভের মতোই অত্যাচারী এবং স্বেচ্ছাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্টলিপিন, স্টুমার, ডুর্ণোভো এবং রাসপুটিন। এই সব লোকের অত্যাচারের ফলে জনগণ বিপ্লবমুখী হয়ে ওঠে। বিপ্লবীরাও এদের অত্যাচারের সুযোগ গ্রহণ করে একদিকে ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের জন্য জনসাধারণকে সুসংবদ্ধ করতে থাকেন অপরদিকে জনসাধারণের সহানুভূতি লাভের আশায় প্রতিটি অত্যাচারের ঘটনার প্রতিশোধ হিসেবে একজন করে পদস্থ রাজকর্মচারীকে হত্যা করতে থাকেন। রাজপুরুষদের হত্যার ব্যাপারে বিপ্লবীরা এমনই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন যে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা ক্রেমলিন প্রাসাদে ঢুকে মস্কোর গ্র্যাণ্ড ডিউক সার্জকে হত্যা করেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে তাঁরা ইউফার দুজন সহকারী গভর্ণরকে হত্যা করেন। এই তিনটি হত্যাকাণ্ড ছাড়া বহুসংখ্যক পুলিশ অফিসারকেও বিপ্লবীরা হত্যা করেন।

এই সব হত্যাকাণ্ড ছাড়া দেশের সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুণ্ঠন এবং ধর্মঘটের ধুম পড়ে যায়। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, এই সব ধর্মঘটে প্রায় সাত

লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করে। ধর্মঘটী শ্রমিকদের এই সংখ্যা হতেই ধর্মঘটের ব্যাপকতা এবং ধর্মঘটীদের বিপ্লবী মনোভাব বুঝতে পারা যায়।

শ্রমিক-অশান্তির কারণ ঃ

রুশ-জাপান যুদ্ধের ত্রিশ বছর আগে থেকেই রাশিয়ায় শিল্পোন্নতির সূচনা হয়। অর্থমন্ত্রী কাউন্ট উইটি ছিলেন রাশিয়ার এই শিল্পোন্নতির প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, শিল্পের উন্নতি না হলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। তিনি তাই রাশিয়ার ধনিক শ্রেণীকে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে বলেন এবং শিল্প-কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে তাঁদের সরকারী সাহায্য দানের কথা ঘোষণা করেন। অর্থমন্ত্রীর আবেদনের ফলে এবং সরকারী সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে ধনিক শ্রেণীর মধ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে যায়। তাঁরা তখন রাশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে শুরু করেন।

এদিকে ভূমিদাস প্রথা রদ হলেও কৃষকেরা যখন দেখতে পেলো যে, তাদের অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে, তখন তারা ভিটে-মাটি ছেড়ে শিল্পাঞ্চলে গিয়ে বিভিন্ন কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতে থাকে। এইভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক আসতে থাকায় কারখানার মালিকরা মজুরীর হার কমিয়ে দেন এবং শ্রমিক ছাঁটাই করে দু'জনের কাজ একজনকে দিয়ে করিয়ে নিতে থাকেন। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, কোনো কোনো কারখানায় দৈনিক ষোল ঘণ্টা হিসেবে শ্রমিকদের খাটানো হতে থাকে। কিন্তু এত সময় কাজ করেও তারা নির্দিষ্ট মজুরীর বেশী মজুরী পেতো না। এছাড়া শ্রমিকরা যাতে ধর্মঘট না করতে পারে তার জন্যে মালিকরা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ধর্মঘটকে বে-আইনি বলে আইন করিয়ে নেন।

শ্রমিকদের বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যের দিকেও মালিকরা নজর দিতেন না। এর ফলে শ্রমিক বস্তিগুলো ছিলো নিতান্তই কদর্য। যে সব শ্রমিক রাত্রে কাজ করতো তাদের শোবার জন্যেও কোনো রকম ব্যবস্থা ছিলো না;

ফলে তাদের কারখানার মেঝেয় অথবা বেঞ্চির উপরে শুয়ে রাত কাটাতে হতো।

শ্রমিকদের অবস্থা যখন এই রকম সেই সময় বিপ্লবীরা পূর্ণ উদ্যমে তাদের মধ্যে প্রচার চালাতে থাকেন। শ্রমিকদের তাঁরা বুঝিয়ে দেন যে, তাদের শ্রমলব্ধ অর্থেই মালিকশ্রেণী দিনের পর দিন স্ফীতোদর হচ্ছে এবং তাদের সিন্দুকে টাকার পাহাড় জমছে, কিন্তু শ্রমিকরা তাদের শ্রমের বিনিময়ে পাচ্ছে আধপেটা আহার, কদর্য অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং কারণে-অকারণে ছাঁটাই। এ অবস্থার প্রতিকারের পথও তাঁরা দেখিয়ে দেন। শ্রমিকদের তাঁরা ভালো-ভাবেই বুঝিয়ে দেন যে, মালিক এবং সরকার একজোট হয়েই তাদের শোষণ করছে। সুতরাং যেমন করেই হোক, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে সরিয়ে দিতে হবে এবং ধর্মঘট করে মালিকদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে আদায় করে নিতে হবে। ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবের কথাও তারা শ্রমিকদের কাছে প্রকাশ করেন এবং তাদের সেই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করতে বলেন।

বিপ্লবীদের এই সব প্রচার কার্যের ফলে শ্রমিকদের মনে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হয়। তারা তখন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করতে শুরু করে।

রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন তখন কি রকম ব্যাপক আকার ধারণ করেছিলো তার প্রমাণ হিসেবে পুটিলভ ইস্পাত-কারখানার ধর্মঘটের কথা উল্লেখ করা চলে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কারখানার প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে।

রক্তস্নাত রবিবার (Bloody Sunday) :

আমরা এখানে যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় জর্জ গেপন নামে একজন ধর্মযাজক সেণ্টপিটার্সবুর্গের শ্রমিকদের ভেতরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পুটিলভ ইস্পাত-কারখানায় যখন ধর্মঘট হয় তখন উক্ত ধর্মযাজক শ্রমিকদের বলেন যে, তিনি এক লক্ষ শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা বের করে রাজপ্রাসাদে গিয়ে জারের কাছে শ্রমিকদের পক্ষে এক আবেদনপত্র পেশ

করবেন। আবেদন পত্রের পূর্ণ বয়ানও তিনি শ্রমিকদের সামনে পড়ে শোনান। ওতে বিদ্রোহের সুর আদৌ ছিল না। ওটা ছিল পিতার কাছে পুত্রদের আবেদনের মতো। স্থির হলো ২২শে জানুয়ারী রবিবার এই শোভাযাত্রা বের হবে।

এই শোভাযাত্রার কথা জারকে আগে থেকেই জানিয়ে দিয়ে প্রার্থনা জানানো হয় যে, তিনি যেন ওই দিন শ্রমিকদের আবেদন পত্রটি গ্রহণ করেন। শ্রমিকরা আশা করেছিলো যে, জার হয়তো তাদের আবেদন গ্রহণ করবেন এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতিকার করবেন।

নির্দিষ্ট দিনেই শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রীরা মহামান্য জারের এক বিরাট প্রতিকৃতি নিয়ে শান্তভাবে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হয়।

কিন্তু প্রাসাদের সামনে গিয়ে শোভাযাত্রীরা দেখতে পায়, তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছে শত শত রাইফেলধারী সৈনিক। জার সেদিন আর প্রাসাদে থাকার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ছোটোলোকদের কথা শুনে সময় নষ্ট করার চেয়ে রবিবারটা প্রমোদ-ভবনে কাটানোই শ্রেয় বিবেচনা করে আগে-ভাগেই তিনি সরে পড়েছিলেন। তবে যাবার আগে তিনি সৈন্য মোতায়েন করে যান প্রাসাদের সামনে—বাজে লোকেরা যাতে প্রাসাদের সামনে এসে হল্লা করে প্রাসাদের শান্তি নষ্ট না করে তার জন্যেই এই সুচারু ব্যবস্থা।

সশস্ত্র সৈনিকদের দেখে শোভাযাত্রীরা মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়ায়। গেপনের কাছে তারা প্রশ্ন করে—এটা কি ব্যাপার? গেপনও বিস্মিত হয়েছিলেন। তবে মনের বিস্ময় মুখে প্রকাশ না করে শ্রমিকদের তিনি বলেন যে, এটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপারে নয়। শোভাযাত্রীরা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দূর করার জন্যেই হয়তো জার এই ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু তাঁর পরিচালিত শোভাযাত্রা যখন শান্তিপূর্ণ তখন আর ভয় কিসের?

এই কথা বলেই গেপন অগ্রসর হন শোভাযাত্রীদের নিয়ে। এর পরেই শুরু হয় বুলেটের অভ্যর্থনা। সৈনিকরা কোনোরকম সাবধান-বাণী উচ্চারণ না করেই জনতার ওপর গুলি বর্ষণ শুরু করে। সৈনিকদের গুলির আঘাতে লুটিয়ে পড়তে থাকে শত শত নিরীহ শ্রমিক। তাদের আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে।

গুলিবর্ষণ শেষ হলে দেখা যায় যে, প্রায় পাঁচশ' শ্রমিক নিহত এবং অসংখ্য লোক আহত হয়েছে। হতাহতের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যাও কম ছিলো না।

এই হত্যাকাণ্ড ২২শে জানুয়ারী রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে রাশিয়ার ইতিহাসে ওই দিনটি 'রক্তস্নাত রবিবার' (Bloody Sunday) নামে চিহ্নিত হয়ে আছে।

জার-প্রাসাদের সামনে সেদিন যে রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছিল, সে রক্তের দাগ আজ মুছে গেছে, কিন্তু সেদিনের সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি এখনো অমলিন হয়ে জেগে আছে প্রতিটি রুশবাসীর মনে।

(রক্তস্নাত রবিবারের এই বর্বরোচিত ঘটনার সঙ্গে আমাদের দেশের জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনা তুলনীয়। ইতি—লেখক)

গেপনের কি হলো ?

এই রকম একটা অমানুষিক হত্যাকাণ্ড যেখানে সংঘটিত হলো, সেখানে জর্জ গেপনের কি হলো সে প্রশ্নটা পাঠকদের মনে নিশ্চয়ই উদিত হবে। আগেই বলা হয়েছে, গেপনই উপরোক্ত শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করেছিলেন। গুলিবর্ষণ শুরু হতেই তিনি আহত হন এবং মরার ভান করে পড়ে থাকেন। এরপর যখন গুলিবর্ষণ শেষ হয় তখন তিনি এক সুযোগে উঠে ওখান থেকে সরে পড়েন।

পরবর্তীকালে দেখা যায় যে, তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে বাস করছেন এবং সেখান থেকেই রুশ-সরকারের ওপর বাচনিক আক্রমণ চালাচ্ছেন। আরও

কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, তিনি রাশিয়ায় ফিরে এসেছেন এবং নির্ভয়ে চলাফেরা করছেন। তাঁর এই ধরণের চাল-চলন বিপ্লবীদের মনে সন্দেহের উদ্রেক করে। তাঁদের মনে হয় যে, ধর্মযাজক মশাই হয়তো জার-সরকারের সঙ্গে একটা গোপন ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। ভদ্রলোকের চাল-চলন এবং কথাবার্তাও এই সন্দেহকে আরও বদ্ধমূল করে। কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন দেখা যায় যে, ফিন সীমান্তের কাছে একটা গ্রামের পাশে তাঁর মৃতদেহ পড়ে আছে এবং তার জামার সঙ্গে পিন দিয়ে এক টুকরো কাগজ এঁটে দেওয়া হয়েছে। কাগজখানায় লেখা রয়েছে—"বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি"।

অশান্ত রাশিয়া ঃ

রক্তস্নাত রবিবারের সেই নৃশংস ঘটনা রাজধানীর মানুষদের মনে, বিশেষ করে শ্রমিকদের মনে যে আগুন জ্বেলে দিলো, সে আগুন অচিরেই সারা রাশিয়ার বুকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। ব্যাপারটা এমনই গুরুতর আকার ধারণ করলো যে, অত্যাচারী জার-সরকার রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লো। জার এবং তাঁর পদলেহী মন্ত্রী ও পদস্থ কর্মচারির দল বেশ বুঝতে পারলেন যে, জনগণের এই রোষবহ্নিকে যদি প্রশমিত করা না যায় তাহলে হয়তো সাম্রাজ্য রক্ষা করাই কঠিন হয়ে পড়বে। তাঁরা তাই ভেবে-চিন্তে এক ইস্তাহার প্রচার করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন যে, রবিবারের সেই শ্রমিক শোভাযাত্রার পেছনে জাপানীদের হাত ছিলো ; জাপানের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েই শ্রমিক-নেতারা ওই শোভাযাত্রা বের করেছিলেন।

রাশিয়ায় তখন জাপানী-বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল ছিলো। জার এবং তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গরা তাই আশা করেছিলেন যে, জাপানী প্ররোচনার কথা প্রচার করলেই জনসাধারণ সরকারের কাজকে সমর্থন করবে। কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, জনমত সব সময় অন্ধভাবে চালিত হয় না। তাই জাপানী প্ররোচনার কথা প্রচারিত হলেও জনগণ সে কথা বিশ্বাস করলো না। তারা তখন আরও প্রবলভাবে জার-সরকারের সমালোচনা করতে লাগলো। শুধু

সমালোচনা করেই তারা ক্ষান্ত হলো না, তারা প্রকাশ্যেই জার-সরকারের নিপাত কামনা করতে লাগলো।

বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন ঃ

জনগণের রূদ্রমূর্ত্তি দেখে জার সরকার বেশ কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লো। জার তখন আর এক আদেশ জারী করে জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক নিহত শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দান করা হবে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, এতেই জনসাধারণ শান্ত হবে, কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হলো না। জনগণ শান্ত তো হলোই না, উপরন্তু বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিলো। লিথুয়ানিয়া ককেসাস এবং পোলাণ্ডেও বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হয়ে উঠলো। এদিকে কৃষ্ণসাগরের রমনীয় নৌ-বহিনীর অধ্যক্ষ প্রিন্স পোটেম্‌কিনও হঠাৎ বিদ্রোহ করে বসলেন। তাঁর সেই বিদ্রেহ দমন করতে জার বাহিনীকে বেশ কিছুটা বেগ পেতে হয়েছিল।

জনমতের কাছে জারের নতিস্বীকার ঃ

রাশিয়ার বিভিন্ন স্থানে এই রকম অশান্তি আর বিদ্রোহ দেখে জার রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তিনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, জাগ্রত জনতাকে আর অগ্রাহ্য করা চলে না। তিনি তাই ১৯শে জুলাই জনগণের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতে রাজী হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে জনপ্রতিনিধিরা জারের সাথে দেখা করে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁকে জানিয়ে দিলেন। জার ধৈর্য সহকারে তাঁদের কথা শুনে বিচার বিবেচনা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

ঠিক এক মাস পরে, অর্থাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯ শে আগষ্ট জার এক ঘোষণা-বাণী জারী করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি জনগণের আশানুযায়ী শাসন-সংস্কার করবার জন্য প্রস্তত আছেন এবং অচিরেই এ কাজটি তিনি সুসম্পন্ন করবেন।

জারের এই ঘোষণায় সংস্কার-পন্থীরা রীতিমত উল্লশিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু শাসন সংস্কার যখন সত্যিই এলো তখন তার রূপ দেখে জনসাধারণ হতাশ হয়ে পড়লো। যে ডুমায় জনসাধারণকে প্রতিনিধি পাঠাবার কথা বলা হলো তার ক্ষমতায় স্বল্পতা দেখে সংস্কার-পন্থীরা হতাশ হয়ে পড়লেন। ডুমা (প্রতিনিধিসভা) শুধু আলোচনা করবার ক্ষমতা পেলো, শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার পেলো না।

অতি আশায় নিরাশ হলে মানুষ যেমন হতাশাগ্রস্ত এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, রাশিয়ার জনসাধারণের অবস্থাও ঠিক তেমনি হলো। তাদের সঙ্গে জার যে এইভাবে প্রহসন করবেন তা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। কিন্তু সেই অভাবিত কাজটিই যখন জার করলেন তখন তারা প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। তাদের এই বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ পেলো একটা বিরাট ধর্মঘটের ভেতর দিয়ে। এই ধর্মঘটটি ট্রটস্কির উদ্যোগে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়।

অভাবনীয় ধর্মঘট এবং বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েট গঠন ঃ

এই ধর্মঘট প্রথমে শুরু হয় মস্কোর একটি ছাপাখানা হতে। সেখান থেকে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে দেশের সর্বত্র। ট্রেনগুলি অচল হয়ে গেল। টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করে দেওয়া হলো, এমনকি জল ও খাদ্য সরবরাহও বন্ধ হয়ে গেল।

অক্টোবর মাসে এই ধর্মঘট এমন আকার ধারণ করলো যে, বিশাল রুশ-সাম্রাজ্য যেন একেবারে অসাড় হয়ে পড়লো।

এই ধর্মঘটের ভেতরেই শুরু হলো বিভিন্ন স্থানে গণসঙ্ঘ (সোভিয়েট) গঠন। সমাজতন্ত্রীরাই এ কাজ প্রথমে শুরু করলেন। দেখতে দেখতে সারা দেশে শত শত সোভিয়েট গঠিত হলো। এরপর গঠিত হলো কেন্দ্রীয় সোভিয়েট। এই কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের সভাপতি হলেন খ্রুস্টালেভ এবং সহকারী সভাপতি হলেন ট্রটস্কি।

ট্রটস্কির ক্রিয়া-কলাপ ঃ

এখানে ট্রটস্কির ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে। রাশিয়ার

গণ-বিপ্লবে ট্রটস্কির অবদান অপরিমেয়। তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেই সময়ই কার্ল মার্কস্-এর মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। এই মতবাদ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। তখন থেকেই তিনি রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারের কথা চিন্তা করতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হলে তিনি বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হন এবং কিছুদিনের মধ্যেই অন্যতম বিপ্লবী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। এরপর তিনি মার্কসীয় গণ-বিপ্লবের পরিকল্পনা অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করতে শুরু করেন।

আগেই বলেছি যে, ট্রটস্কি নব প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সোভিয়েটের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়াও তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গে একটি সোভিয়েট গঠন করে নিজে তার সভাপতি হন। এই সময় সোভিয়েট সম্বন্ধে যাতে জনসাধারণের কোনোরকম ভ্রান্ত ধারণা না জন্মে সেই উদ্দেশ্যে তিনি 'সোভিয়েট'-এর ব্যাখ্যা প্রচার করেন। ট্রটস্কির এই ব্যাখ্যা হলো, "সোভিয়েট-প্রথা সুদৃঢ় গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর অর্থ, ব্যষ্টির ওপর সমষ্টির কর্তৃত্ব।"

উপরে যে 'অভাবনীয় ধর্মঘট'-এর কথা বলা হয়েছে, সেই ধর্মঘটও প্রধানতঃ ট্রটস্কির উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। কিন্তু এই ধর্মঘটের আগেই তিনি বিপ্লবী লেখক হিসেবে সারা রাশিয়ায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হতো সেগুলোতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করতেন যে, রাশিয়ার গণ-বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী এবং তা সম্পন্ন হবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে। তিনি আরও লিখেছিলেন যে, এই বিপ্লব রাশিয়ার বুক থেকে আমলাতন্ত্রকে চিরতরে উচ্ছেদ করে তার জায়গায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। গণ-বিপ্লব সম্বন্ধে তিনি লেখেন যে, বিপ্লবের আগে কতকগুলি রাজনৈতিক ধর্মঘট অত্যাবশ্যক।

এই মতবাদ অনুসারেই ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ধর্মঘটে তিনি সাবর আগে ঝাঁপিয়ে

পড়েন। এই ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা হতে তিনি যে শিক্ষালাভ করেন তার ফলে তিনি প্রচার করেন যে, জারতন্ত্র হতে সরাসরি সমাজতন্ত্রবাদে পৌছানো মোটেই অসম্ভব নয়। নানা যুক্তি দিয়ে তিনি তাঁর এই অভিমত প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই সময় তিনিই সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে, 'শ্রমিক-শ্রেণীই একমাত্র বিপ্লবী শক্তি' এবং বিপ্লব যদি সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে সে রাষ্ট্রের নেতৃত্বও থাকবে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে; কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের সবসময় কৃষকদের সমর্থন প্রয়োজন হবে। ধনিকশ্রেণী সম্বন্ধে তিনি বলেন, ওরা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও দিনের পর দিন কমে আসছে।

ট্রটস্কি সে সময় যে সব অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেগুলি অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়।

১৯০৫ সালের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেবার অপরাধে জার-সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে যাবজ্জীবন নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করে। সে সময় যাঁদের নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হতো তাঁদের সবাইকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হতো। ট্রটস্কিকেও সেখানেই পাঠানো হবে বলে স্থির হয়। কিন্তু সাইবেরিয়ায় পাঠাবার আগে তাঁকে আড়াই বছর কাল নির্জন কারাকক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো।

অবশেষে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে প্রচণ্ড তুষারপাতের ভেতর তাঁকে সশস্ত্র প্রহরাধীনে সাইবেবিয়া অভিমুখে পাঠানো হয়। তাঁকে দেখবার জন্যে প্রত্যেক রেল-স্টেশনে বিরাট-জনতা সমবেত হয়েছিলো। রেলপথ শেষ হয় টিউমেন স্টেশনে। সাইবেরিয়ায় যেতে হলে ওখান থেকে স্লেজ গাড়িতে করে যেতে হতো।

প্রহরীরা যখন যাত্রার ব্যবস্থা করছিলো সেই সময় তাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে ট্রটস্কি বল্গাহরিণ-বাহিত শ্লেজ-গাড়িতে উঠে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। এবং প্রায় পাঁচশ' মাইল বরফের ওপর দিয়ে গিয়ে এবং নানা বাধা-বিঘ্ন

অতিক্রম করে অবশেষে তিনি ভিয়েনায় উপস্থিত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে পর্যন্ত সেখানেই তিনি ছিলেন।*

এখন আবার ফিরে আসছি পূর্ব কথায়। ধর্মঘটের ব্যাপকতা এবং প্রচণ্ডতা দেখে জার এবার রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া আর চলবে না। তাঁবেদার মন্ত্রীদের ওপরেও আর তিনি আস্থা রাখতে পারলেন না। তিনি তখন কাউণ্ট উইটিকে ডেকে তাঁর পরামর্শ চাইলেন।

কাউণ্ট উইটির পরামর্শে এতোদিন তিনি কর্ণপাতই করেন নি। কিন্তু এবার তিনি বিপদে পড়ে তাঁর দিকেই চাইলেন। কাউণ্ট তাঁকে স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, রাষ্ট্রক্ষমতা যদি হাতে রাখতে হয় তাহলে জনগণের দাবী পূর্ণ করতেই হবে।

জারের নতুন ঘোষণাবাণী ঃ

কাউণ্ট উইটির কথা জার এবার মেনে নিলেন। তিনি তখন এক ঘোষণাবাণী জারী করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন—"এখন হতে জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বক্তৃতার স্বাধীনতা এবং সমিতি গঠনের স্বাধীনতা পুরোপুরি মেনে নেওয়া হবে। যে সব সম্প্রদায় এতোদিন ডুমায় তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারেনি তাদেরও এখন সে অধিকার দেওয়া হবে।"

ঘোষণাবাণীতে আরও বলা হলো—ডুমাই হবে তাদের সর্বোচ্চ আইন পরিষদ ; ডুমার অনুমোদন ছাড়া কোনো আইন প্রবর্তিত হবে না। রাজকর্মচারীদের কাজকর্মের ওপরেও ডুমার পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকবে।

এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর।

রাজকীয় ঘোষণাবাণীর প্রতিক্রিয়া ঃ

জারের এই ঘোষণা কোনো কোনো মহলকে খুশি করলেও বিপ্লবীরা এতে

* এরপর কি হয়েছিল সে কথা পরে বলা হবে।

মোটেই খুশি হলেন না। তাঁরা বললেন, জারের এই ঘোষণায় জনসাধারণ বিশেষ কোনো রাজনৈতিক অধিকার পায়নি। যেটুকু অধিকার তাদের দেওয়া হবে বলে প্রচারিত হয়েছে, সেরকম অধিকার প্রত্যেক সভ্য দেশের জনসাধারণই ভোগ করে থাকে।

উদারপন্থিগণ কিন্তু ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করলেন। তারা বললেন, জারের এই ঘোষণা জনগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষাকে পুরোপুরি না মিটালেও কতকাংশে যে মিটিয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং যা পাওয়া গেছে তাকে বর্জন না করে ভবিষ্যতে আরও বেশি অধিকার লাভের জন্যে সংগ্রাম করতে হবে।

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই রকম মতভেদ দেখা দেবার ফলে বিপ্লবী নেতারা ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন বলেই স্থির করলেন; পক্ষান্তরে উদারপন্থিগণ গণ-আন্দোলন হতে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিলেন।

আন্দোলনে এইভাবে ফাটল ধরায় ধর্মঘটেও বেশ কিছুটা ভাটা পড়লো। ব্যাপার দেখে বিপ্লবীরা বুঝতে পারলেন যে, উদারপন্থীদের ওপরে ভরসা রেখে গণ-আন্দোলন চালানো যাবে না। সামান্য একটু সুযোগ-সুবিধে পেলেই তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরোধীতা করবে। বিপ্লবীদের আরও মনে হলো যে, অর্থনৈতিক আন্দোলন তথা মজুরী বৃদ্ধির আন্দোলন দ্বারা আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। নিরস্ত্র ধর্মঘটকে শাসকরা সহজেই ভেঙে দিতে পারে ধর্মঘটীদের ওপরে সশস্ত্র পুলিশ দলকে লেলিয়ে দিয়ে। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণীর হাতে চাই অস্ত্র। গণ-আন্দোলনের সঙ্গে অস্ত্রবল যুক্ত না হলে অর্থনৈতিক আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই অভিমতের প্রবক্তা ছিলেন ট্রটস্কি। বিপ্লবীরা তাঁর অভিমত মেনে নেন এবং তাঁর নেতৃত্বে সশস্ত্র-বিপ্লবের আয়োজন করতে সচেষ্ট হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন করতে হলে কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। বিপ্লবীরা তাই কিছুটা সময় নেবার জন্যে ৩১শে অক্টোবরের ধর্মঘটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

এই সময় বিপ্লবীদের মধ্যে লেনিনও উপস্থিত ছিলেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে গোপনে রাশিয়ায় এসে তিনি তখন ট্রটস্কির সাথে একযোগে কাজ করছিলেন। এই সময় তিনি বুঝতে পারেন যে, শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যদি কৃষকরা সামিল না হন তাহলে আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হতে পারে না। উদারপন্থী পাতি-বুর্জোয়াদের চরিত্রও তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তিনি তাই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে থাকেন। এদিকে জার সরকার তখন রাশিয়ায় লেনিনের উপস্থিতির সংবাদ জেনে ফেলেছে। এর ফলে জারের পুলিশরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে। লেনিন তখন আবার গা-ঢাকা দেন এবং গোপন পথে সুইজারল্যাণ্ডে চলে যান।

এরপর জার যখন তাঁর শাসন-সংস্কারের ঘোষণাবাণী প্রচার করেন, তখনও লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে। তিনি সেখান থেকেই তাঁর বিপ্লবী বন্ধুদের বলে পাঠান, 'জারের এই শাসন-সংস্কার আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।'

লেনিনের জীবন ও বাণী ঃ

এবার লেনিনের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। লেনিনের আসল নাম হলো ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ্। কিন্তু লেনিন নামেই তিনি সমধিক পরিচিত।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল রাশিয়ার এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। পরবর্তীকালে তিনি সিমব্রিস্ক প্রদেশে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হন।

লেনিনের প্রাথমিক শিক্ষাও ওখানেই শুরু হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হলে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখানে অধ্যয়নকালে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সেই অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিতাড়িত হন। তখন থেকেই পুলিশ তাঁর ওপর গোপনে নজর রাখে।

কাজান বিশ্ববিদ্যালম হতে বিতাড়িত হবার পর তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখানে শিক্ষা লাভ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এই সময় তিনি 'শ্রমিক-মুক্তি সঙ্ঘ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে মার্কসবাদী বিপ্লবীদের সম্মিলিত করতে সচেষ্ট হন। এই সময় তিনি শ্রমিকদের সঙ্গেই তাদের বস্তিতে বাস করতেন এবং তাদের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ করতেন।

সে সময় সেণ্টপিটার্সবুর্গে যতগুলি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় তার সবগুলিই পরিচালিত হয় লেনিনের নেতৃত্বে। এই কারণে বহুবার তাঁকে পুলিশের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, রাশিয়ায় বাস করাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি তাই রাশিয়া পরিত্যাগ করে বিদেশে চলে যান এবং সেখান থেকে বিপ্লববাদমূলক পুস্তকাদি গোপন পথে রাশিয়ার বিপ্লবীদের কাছে পাঠাতেন। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র পঁচিশ বছর।

কিছুকাল বিদেশে থাকার পর আবার তিনি রাশিয়ায় ফিরে আসেন এবং 'লেবার্স ওয়ার্ক' নামে একখানা পত্রিকা বের করেন। পত্রিকাখানা অল্পদিনের মধ্যেই শ্রমিক মহলে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ওই পত্রিকাখানা প্রকাশিত হতো গুপ্তভাবে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ তা জেনে ফেলে। তারা তখন লেনিনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। আদালতের বিচারে তাঁর প্রতি তিন বছর নির্বাসন দণ্ডের আদেশ হয় এবং তিনি সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন।

সাইবেরিয়ায় থাকাকালে তিনি 'Development of Capitalism in Russia' নামে একখানা বই লেখেন। তিন বছর নির্বাসিত থাকার পর তিনি যখন আবার ফিরে আসেন তখন তার ওপরে সরকারী আদেশ জারী হয় যে, তিনি কোনো ছাত্রকেন্দ্রে অথবা শ্রমিককেন্দ্রে যেতে পারবেন না। এই রকম অবস্থায় রাশিয়ায় বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করে তিনি আবার বিদেশে চলে যান। এটা হলো ১৯০০ সালের কথা।

পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯০১ সালে তিনি 'ইসক্রা' (Iskra) পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এর দুই বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৩ সালে লণ্ডনে রুশ সমাজতন্ত্রীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লেনিন সে সম্মেলনে যোগ দেন। উক্ত সম্মেলনে সমাজতন্ত্রীরা 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক' নামে দুটি আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে যায়। লেনিনই বলশেভিক দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তিনি 'ফরোয়ার্ড' নামে একখানা পত্রিকা বের করেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচার করেন, রাশিয়ায় যদি বুর্জোয়া-বিপ্লব সাফল্য লাভ করে তবুও সমাজতন্ত্রীদের কাজ শেষ হবে না। বুর্জোয়া রাষ্ট্রতন্ত্রের উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কর্তব্য শেষ হবে না। এই বছর রাশিয়ায় যে গণ-আন্দোলন শুরু হয় তাতেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। আগেই বলেছি যে, ওই সময় তিনি সুইজারল্যাণ্ড থেকে গোপনে রাশিয়ায় আসেন এবং ট্রটস্কি ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আবার সুইজারল্যাণ্ডে ফিরে যান। ফিনল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সেও তিনি কিছুদিন বাস করেন। ওই সব দেশেও তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। মার্কসবাদকে কিভাবে রূপ দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে তিনি তখন গবেষণা করতে থাকেন এবং ভবিষ্যৎ গণ-বিপ্লবে সোভিয়েটের কর্তব্য কি হবে সে সম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তিকা ছেপে গোপন পথে রাশিয়ায় পাঠাতে থাকেন।

এখানে এই পর্যন্তই বলা হলো। তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনাগুলো যথা সময়ে বর্ণিত হবে। এখন আমরা আবার পূর্বকথায় ফিরে আসছি।

বলশেভিক দলের মতামত ও কর্মপদ্ধতি ঃ

লেনিন সম্বন্ধে আলোচনার সময় আমরা বলেছি যে, ১৯০৩ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত রুশ-সমাজতন্ত্রীদের এক সম্মেলনে সমাজতন্ত্রীরা 'বলশেভিক' ও 'মেনশেভিক' নামে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। এরপর বলশেভিক দল এক নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন।

বলশেভিক দলের মতামত হলো ঃ জারের রাজত্বে শ্রমিকদের পক্ষে যে

কোনো কথাই বলা হোক না কেন এবং তার পেছনে যতরকম যুক্তিই থাকুক না কেন, সরকারের কাছে তা বে-আইনী বলে মনে হবেই। এই দল আরও বলতেন যে, জারতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করতে না পারলে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করা যাবে না। অতএব যেভাবেই হোক বিপ্লবের আদর্শকে সবার ওপরে তুলে ধরতে হবে—মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধের স্থান হবে নিচে। বলশেভিক দল আরও প্রচার করলেন যে, দলের প্রতিটি পদক্ষেপ তাকে বিপ্লবমুখী করে তুলবে। এ ব্যাপারে দলের সদস্যরা এক দিকে বিপ্লবের জন্যে আয়োজন করতে থাকবে, অপর দিকে ডুমায় প্রবেশ করে তার সুযোগ-সুবিধে-গুলো গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য ; এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন মহামতি লেনিন। কিন্তু তাঁর এই মতবাদকে কিছু সংখ্যক নেতা মেনে নিতে পারলেন না। এঁরা ম্যাক্সিম গোর্কির নেতৃত্বে দলের মধ্যে একটি উপদলের সৃষ্টি করলেন। এঁরা বলতেন, কোনো অবস্থায়ই ডুমায় যোগদান এবং আইনসম্মত আন্দোলনের পথে চলা উচিত হবে না। এটা করা হলে দলের বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করে সংস্কারের পথে পা বাড়াবেন। এবং এতে শুধু শক্তির অপচয় হবে, বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে না।

কিন্তু এই উপদলের বক্তব্য দলের বেশিরভাগ সদস্যই মেনে নিলেন না। তাঁরা বললেন, 'গুপ্ত পন্থা' দ্বারা দলের কাঠামোকে যেমন সুদৃঢ় রাখতে হবে, তেমনি ডুমার ভেতরে ঢুকে অন্যান্য আইনসম্মত উপায়ে জনসাধারণের সংস্পর্শে এসে তাদের বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন করে তুলতে হবে। অর্থাৎ, এক কথায়, আইনসম্মত এবং আইন-বিরোধী উভয় পন্থা অবলম্বন করেই দলকে বিপ্লবের পথে এগোতে হবে।

এই মনোভাব নিয়েই পরবর্তী বৎসরে (অর্থাৎ ১৯০৬ সালে) বলশেভিকদল ডুমায় প্রবেশ করলেন।

মেনশেভিক দলের মতবাত ও কর্মপদ্ধতি ঃ

এবার মেনশেভিক দলের মতবাদ ও কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। এঁদের

অভিমত হলো, ডুমার ওপর যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে সেই ক্ষমতাবলেই জনসাধারণের হাতে গণতান্ত্রিক অধিকার থাকবে। এই অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে এঁরা আরও বলেন যে, এখন থেকে শ্রমিকদের আইনসম্মত পথেই চলতে হবে এবং বিপ্লবের বে-আইনী পথ তাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। ডুমাই তাদের স্বার্থ রক্ষা করবে। অতএব তারা যেন ডুমার ওপরে সর্বতোভাবে আস্থা রাখে। তবে শ্রমিকরা ইচ্ছে করলে একখানা পত্রিকা বের করে সেই পত্রিকায় তাদের অভাব-অভিযোগের কথা প্রকাশ করতে পারবে। মোট কথা, মেনশেভিক দল বিপ্লবের পথ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করে আইনসম্মত আন্দোলনের পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়ালো।

বলশেভিক দলের মধ্যে যেমন একটা উপদল সৃষ্টি হয়েছিলো, মেনশেভিক দলের মধ্যেও তেমনি একটা উপদল গড়ে উঠলো। এই উপদলটি গঠিত হলো প্লেখানভের নেতৃত্বে।

উভয় দলের কার্য পদ্ধতির তুলনামূলক বিচার ঃ

এবার বলশেভিক ও মেনশেভিকদের কার্যপদ্ধতির তুলনামূলক বিচার করা যাক। বলশেভিকরা ডুমায় প্রবেশ করার বিরোধী ছিলেন না। লেনিন বলতেন, "ডুমায় প্রবেশ করার আংশিক স্বার্থকতা আছে। আমরা কখনো আপোষ-মীমাংসার পথে পা বাড়াবো না, অথবা বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের কাছে আত্মবিক্রয় করবো না। আমরা ডুমায় প্রবেশ করবো জারতন্ত্রের এবং বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের আসল চেহারাকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে। আমরা ডুমায় প্রবেশ করবো বিপ্লবের মর্মকথা প্রচার করতে এবং জনসাধারণকে ভবিষ্যৎ বিপ্লবের জন্যে সুগঠিত করতে।"

পক্ষান্তরে মেনশেভিকরা মনে করতেন যে, ডুমার ভেতর দিয়েই রাষ্ট্রক্ষমতা জনসাধারণের হাতে আসবে। তাঁরা এই বিশ্বাসকে মনে-প্রাণে আঁকড়ে ধরে রাখার ফলে ক্রমশঃ বুর্জোয়াতন্ত্রের সমর্থক হয়ে পড়লেন। তাঁরা চাইতেন জারের সঙ্গে একটা আপোষে আসতে। মেনশেভিক নেতাদের এই ধরণের বিপ্লব-

বিরোধী মনোভাবের জন্যেই তাঁদের দলের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিলো এবং প্লেখানভের নেতৃত্বে একটি উপদল গঠিত হয়েছিলো। প্লেখানভ বিপ্লবী নীতির সমর্থক ছিলেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় যে, তিনিও বলশেভিকদের বিরোধীতায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে এই রকম মতপার্থক্যের সৃষ্টি হওয়ায় গণ-আন্দোলনের ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা করে ট্রটস্কি উভয় দলকে একত্রিত করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু উভয় দলের নেতাদের বিরাট মতবৈষম্যের জন্যে তিনি এতে সফলকাম হন না। ফলে উভয় দলই নিজ নিজ মতবাদে অনড় থেকে ডুমায় প্রবেশ করলেন।

প্রথম ডুমা ঃ

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন নবগঠিত ডুমার উদ্বোধন হলো। এই ডুমা মাত্র ৭২ দিন স্থায়ী হয়েছিলো। ডুমায় গণতন্ত্রী দলই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁরা জার-সরকারের সঙ্গে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আপোষ-মীমাংসায় আসতে চান, কিন্তু অন্যান্য সদস্যরা এতে প্রবল আপত্তি উত্থাপন করে পদে পদে গণতন্ত্রীদের বাধা দিতে থাকেন। এই ৭২ দিনের ডুমায় যে বাক-যুদ্ধ চলে তা রাশিয়ার ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এই বাক-যুদ্ধের ফলে সদস্যরা অবশেষে শাসন-সংস্কারের পক্ষে ঐক্য-মাত্য আসেন। জার কিন্তু মনে-প্রাণে এটা চাইছিলেন না। তাই সংস্কারের পক্ষে ডুমার দাবী যখন প্রবল হয়ে উঠলো, জার তখন ডুমা ভেঙে দিলেন রাশিয়ার ইতিহাসে এই স্বল্পকালস্থায়ী ডুমাকে 'The Duma of National Indignation' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চ পুনরায় নতুন ডুমা গঠনের কথা বললেন।

ডুমা ভেঙে দেবার সাথে সাথেই গণতন্ত্রীদের ওপর নির্যাতন শুরু হলো। এই নির্যাতনের ফলে অনেক নেতা রাশিয়া পরিত্যাগ করে ফিনল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা এক ইস্তাহার প্রচার করে তাতে বললেন যে,

এখন হতে রাশিয়ার জনসাধারণ যেন জার-সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম শুরু করে।

দ্বিতীয় ডুমা ঃ

আগেই বলা হয়েছে যে, জার ১৯০৭ সনের ৫ই মার্চ দ্বিতীয় ডুমা আহ্বান করেছিলেন। নির্দিষ্ট দিনেই দ্বিতীয় ডুমার অধিবেশন বসলো। এই ডুমায় মেনশেভিক ও বলশেভিক উভয় দলই অংশগ্রহণ করলো। উভয় দলের মিলিত নাম হলো 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দল'। আগের বারে উভয় দলের মধ্যে মতবিরোধের ফলে কোনো দলই ডুমায় প্রবেশ করেনি, কিন্তু পরবর্তীকালে উভয় দলই ডুমায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই উভয় দলই ডুমার প্রবেশ করে।

ডুমায় এই দুই দলের মিলিত সদস্যের সংখ্যা ছিলো ষাটজন। এই ষাটজন সদস্য ডুমায় প্রবেশ করে প্রথম দিন থেকেই বিপ্লবী মনোভাবের পরিচয় দিতে শুরু করলেন। ব্যাপার দেখে জার এবং তাঁর মন্ত্রীরা প্রমাদ গণলেন। এবারও তাই ডুমা ভেঙে দেওয়া হলো।

এই দ্বিতীয় ডুমা তিন মাসের বেশি স্থায়ী হয়নি। এই অল্প সময়ের মধ্যে সদস্যরা জার সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কোনো অধিকার অর্জন করতে পারেনি। ইতিমধ্যে স্টলিপিন নামে এক প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করেন। মন্ত্রী হয়েই তিনি সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করবার দাবি জানালেন। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন যে, এই দলের নেতারা জারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। নতুন আইন অনুসারে ডুমার কোনো সদস্যকে গ্রেপ্তার করতে হলে ডুমার অনুমতির প্রয়োজন ছিলো। এই কারণেই স্টলিপিন ডুমার কাছে অনুমতি চাইলেন। ডুমা এই অনুমতি না দেওয়ায় স্টলিপিনের পরামর্শে জার আবার ডুমা ভেঙে দিলেন।

এরপর সদস্যদের গ্রেপ্তার করতে আর কোনো বাধা রইলো না। জার-সরকার তখন স্টলিপিন কর্তৃক চিহ্নিত রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে

তাদের বিচারালয়ে সোপর্দ করলেন। সে সময় রাশিয়ার বিচার-ব্যবস্থা কি রকম ছিলো সে কথা আগেই বলা হয়েছে। তাই বিচারের নামে অবিচার করে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনকে দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং কয়েকজনকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হলো।

এদিকে ডুমা ভেঙে দেওয়ায় আর এক জটিল রাজনৈতিক সমস্যার উদ্ভব হলো। জারের ঘোষণা অনুযায়ী জনসাধারণকে যেসব রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়েছিলো সেগুলোর মধ্যে ডুমায় তাদের প্রতিনিধি পাঠানো ছিলো অন্যতম অধিকার। সুতরাং কথা উঠলো যে, ডুমা ভেঙে দিলেও জনসাধারণ আবার প্রতিনিধি নির্বাচিত করে নতুন করে ডুমা গঠন করবে। এবং তা করা হলে নতুন যেসব সদস্য ডুমায় আসবেন তাঁরা অবশ্যই জার সরকারের বিরোধিতা করবেন।

এই জটিল সমস্যা নিয়ে মন্ত্রীসভাতেও নানারকম বাদানুবাদের সৃষ্টি হলো। স্টলিপিন প্রমুখ কতিপয় মন্ত্রী শাসন-সংস্কারের ঘোষণাকে বাতিল করবার কথা বললেন। কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রীরা তাতে রাজী হলেন না। স্টলিপিন কিন্তু দমে গেলেন না। তিনি জারকে দিয়ে ভোট দানের অধিকার সম্পর্কে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করিয়ে নিলেন। স্থির হলো যে, পরবর্তী ডুমার সদস্যগণকে এই নতুন নিয়ম অনুসারেই নির্বাচিত করতে হবে। এর ফলে পরবর্তী নির্বাচনের শেষে দেখা গেল যে, সরকারের সমর্থকরাই ডুমায় প্রাধান্যলাভ করেছে।

এই তৃতীয় ডুমা সম্বন্ধে কাউন্ট উইটি মন্তব্য করেন, "এ ডুমা জনগণের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত ডুমা নয়, এটা হলো স্টলিপিনের তাঁবেদারদের ডুমা।"

তৃতীয় ডুমা ঃ

স্টলিপিন না চাইলেও কিছুসংখ্যক বিপ্লবী নেতা এবারেও ডুমায় প্রবেশ করতে সক্ষম হলেন। কিন্তু অধিবেশন শুরু হতেই তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, স্টলিপিন যতদিন মন্ত্রীসভায় থাকবেন, ততদিন তাঁরা কিছুই করতে পারবেন

না। সুতরাং তাঁরা বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, স্টলিপিনকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

এরপর থেকেই শুরু হলো স্টলিপিনকে হত্যা করবার চেষ্টা। বিপ্লবীরা কয়েকবার ব্যর্থ হলেও অবশেষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তাঁরা স্টলিপিনকে হত্যা করেন। স্টলিপিন সেদিন জারের সঙ্গে কিয়েভের এক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। এই সময় জনৈক বিপ্লবীর গুলিতে তিনি নিহত হন।

স্টলিপিনের মৃত্যুর পর তৃতীয় ডুমা ভেঙে দেওয়া হয়। পরবর্তী ডুমা (অর্থাৎ চতুর্থ ডুমা) আহ্বান করা হয় ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। ভোটদানের নিয়ম-কানুনও আর একবার পরিবর্তন করা হয়।

চতুর্থ ডুমা ঃ

নির্বাচন পর্ব শেষ হলে দেখা যায় যে, সোস্যাল ডেমক্র্যাটরা এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। জার মনে মনে এটা না চাইলেও বাধ্য হয়েই এই নবগঠিত ডুমাকে মেনে নিলেন। সোস্যাল ডেমোক্র্যাটরা মাইকেল রডজিয়াঙ্কো নামে একজন রাজনীতিবিদকে তাঁদের নেতা মনোনীত করে ডুমার ভেতরে বাক-যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন। রাশিয়ার ইতিহাসে রড্‌জিয়াঙ্কোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হলো, তিনি বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন হলেও গণবিপ্লবে তাঁর অপরিমেয় অবদান ছিল।

এই ডুমার সময়ে রাশিয়ার নানাস্থানে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়ে যায়। এইসব ধর্মঘটের মধ্যে সাইবেরিয়ার লেনা স্বর্ণখনির ধর্মঘটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মঘট শুরু হলে ধর্মঘটী শ্রমিকদের সায়েস্তা করবার জন্য জার-সরকার একদল সৈন্যকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। সৈনিকরা সেখানে উপস্থিত হয়েই শ্রমিকদের ওপরে বে-পরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে। গুলিবর্ষণের ফলে শত শত শ্রমিক নিহত এবং হাজার হাজার শ্রমিক আহত হন। লেনার এই

অমানুষিক হত্যাকাণ্ড রাশিয়ার ইতিহাসে BLOOD BATH নামে কুখ্যাত হয়ে আছে।

জার সরকারের এই নৃশংস কাজের ফলে সমগ্র রাশিার শ্রমিক সম্প্রদায় উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। ডুমার ভেতরেও প্রচণ্ড প্রতিবাদ এবং বিক্ষোভ শুরু হয়। বিপ্লবী নেতারা স্থির করেন যে, লেনার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তাঁরা ১লা মে সারা রাশিয়ায় ব্যাপকভাবে ধর্মঘটের ডাক দেবেন।

মে দিবস ঃ

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। এই ডাকে শ্রমিকশ্রেণী বিপুলভাবে সাড়া দেন। বিভিন্ন তথ্য হতে জানা যায় যে, মে দিবসের ধর্মঘটে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মনে আগে থেকেই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে ছিল। সুতরাং নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁরা ব্যাপকভাবে ধর্মঘট শুরু করেন। একমাত্র সেণ্টপিটার্সবুর্গেই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করেন। অন্যান্য জায়গাতেও বিরাটভাবে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ সালের ধর্মঘট যেরকম ব্যাপক হয়ে উঠেছিল, এবারের ধর্মঘটও সেইভাবে সারা রাশিয়াকে অসাড় করে ফেলেছিল। এর পরেই শুরু হলো শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর লড়াই। পুলিশরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের আক্রমণ করায় তারাও প্রতি-আক্রমণ চালাতে থাকে। শ্রমিকরা তখন এমনই মারমুখী হয়ে উঠেছেন যে, পড়ে পড়ে মার খেতে তারা রাজী ছিলেন না। তাঁরা ভাঙা গাড়ি ও লোহালক্কড় দিয়ে রাজপথগুলি রুদ্ধ করে দেন এবং লোহার ডাণ্ডা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে পুলিশদের মোকাবিলা করতে থাকেন। কিন্তু লাঠি আর লোহার ডাণ্ডা দিয়ে তো আগ্নেয়াস্ত্রের মোকাবিলা করা যায় না। সুতরাং সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তাঁরা এঁটে উঠতে পারলো না। প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিশদল শ্রমিকদের নৃশংসভাবে হত্যা করে। সেণ্টপিটার্সবুর্গের রাজপথগুলি শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে ফাটল ঃ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বলশেভিক আর মেনশেভিকদের মধ্যে মতবিরোধ ছিলো। তবুও ট্রটস্কি প্রমুখ কতিপয় নেতার পরামর্শে তাঁরা ডুমার ভেতরে একযোগে কাজ করতে সম্মত হন। এর ফলে জোড়াতালি দিয়ে কোনোরকমে একটা ঐক্য স্থাপিত হয় এবং উভয় দলই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের অধীনে ডুমায় প্রবেশ করেন।

এই সময় রাশিয়ার শ্রমিকরা রাজনীতিতে সচেতন হয়ে উঠেছেন। সেই নবজাগ্রত শ্রমিকদের নেতৃত্বের আসন কে দখল করবে তা নিয়ে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। মেনশেভিক নেতারা শ্রমিকদের তরফ থেকে জারের কাছে এক আবেদন করে শ্রমিক সমিতি গঠন এবং ধর্মঘট করবার অধিকার প্রার্থনা করেন। অপর দিকে বলশেভিক নেতারা প্রচার করেন, শ্রমিকদের দাবি হবে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং জমিদারি প্রথার ও উচ্ছেদ দৈনিক খাটুনির সময় হ্রাস করে আট ঘণ্টায় আনা। বলশেভিক নেতারা আরও বলতেন যে, শ্রমিকরা জারের অনুগ্রহ প্রার্থী নয়; তাঁরা নিজের শক্তিতেই অধিকার আদায় করে নেবেন। বলশেভিকদের এই প্রচারের ফলে শ্রমিক ও কৃষকদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। শ্রমিকরা জার-সরকারের পীড়ণে দিনের পর দিন অসহনীয় যন্ত্রণা সহ্য করে এসেছেন; স্থতরাং তাঁরা সংস্কারপন্থী মেনশেভিকদের চেয়ে বিপ্লবী বলশেভিকদেরই নিজের লোক বলে মনে করেন।

১৯০৫-০৬ সালে বলশেভিকরা শ্রমিকদের সাথে একযোগে লড়াই করেছেন এবং জার-সৈন্যের রাইফেলের সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দিয়েছেন। কিন্তু মেনশেভিকরা তখন আদৌ এগিয়ে আসেননি। তাঁরা শুধু দূরে থেকে উপদেশ বর্ষণ করেই দায় সেরেছেন।

স্থতরাং শ্রমিকরা যে, বলশেভিকদের নেতৃত্বই বেশি পছন্দ করবে এতে কোনোরকম সংশয় থাকার কথা নয়। এই কারণেই মেনশেভিকরা শ্রমিক-

শ্রেণীর নেতৃত্বের আসন দখল করতে পারলো না। সে আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলো বলশেভিকরা।

বলশেভিকদের কাছে এইভাবে পরাজিত হয়ে মেনশেভিকরা স্থির করলেন যে, তাঁরা বলশেভিকদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেরা আলাদাভাবে দল গঠন করবেন। মেনশেভিকদের এই সংকল্পের ফলে অচিরেই সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলে ভাঙন দেখা দিলো। ডুমার ভেতরেও দেখা দিল এর প্রতিক্রিয়া। ফলে, দুই দলের একত্র কাজ করা আর সম্ভব হলো না।

'প্রাভ্‌দা' ও 'ইসভেস্তিয়া' পত্রিকা প্রকাশ ঃ

বলশেভিকরা তখন 'সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ওয়াকার্স্ পার্টি' নামে একটি নতুন দল গঠন করলেন এবং 'প্রাভ্‌দা' ও 'ইসভেস্তিয়া' নামে দুখানা পত্রিকা বের করলেন। এই পত্রিকা দুটিই হলো বলশেভিক দলের তথা শ্রমিকদের মুখপত্র।

বলশেভিকদের দেখাদেখি মেনশেভিকরাও একখানা মুখপত্র বের করলেন। সে পত্রিকার নাম তাঁরা দিলেন 'নাসা-লোরিয়া'। তাঁরা দাবি করলেন যে, 'নাসা-লোরিয়া'ই শ্রমিকদের প্রকৃত মুখপত্র। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, শ্রমিকশ্রেণী বলশেভিকদের কথামতই চলছে।

এই সময় অন্যতম বিপ্লবী নেতা আলেকজাণ্ডার কেরেনস্কি* দক্ষিণ রাশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার করছিলেন। ঠিক এই সময়েই প্রথম মহাযুদ্ধ ঘোষিত হয়। বিপ্লবী নেতারা এটাকে একটা বড়ো রকমের সুযোগ বলে মনে করেন ; এবং এ সুযোগ উপেক্ষা না করে গণ-বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হতে থাকেন।

---

* গন বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার পর প্রথমে যে বিপ্লবী সরকার গঠিত হয় কেরেনস্কি ছিলেন সেই সরকারের কর্ণধার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গণ-বিপ্লবের আয়োজন

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ একদিন সারা পৃথিবী শুনতে পেলো, জনৈক সার্ভিয়ান যুবকের গুলিতে অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হয়েছেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক থেকে ঘটনাটা তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। যুবরাজকে যে যুবক হত্যা করেছে তাকে আইন অনুসারে দণ্ড দিলেই ব্যাপারটা মিটে যেতো। কিন্তু বস্তুতঃ এতো সহজে ব্যাপারটা মিটলো না।

২৩শে জুলাই অষ্ট্রিয় সরকার এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে সার্ভিয়ার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করে পাঠালো এবং হত্যাকারীর বিচারের জন্যে কতকগুলো শর্ত আরোপ করে বললো যে, ওই সব শর্ত প্রতিপালিত না হলে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে।

২৫শে জুলাই সার্ভ-সরকার অষ্ট্রিয় সরকারের কাছে যে উত্তর পাঠালো তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পেছন থেকে অপর কোনো শক্তি যদি কলকাঠি না নাড়তো তাহলে হয়তো দুই রাষ্ট্রের ভেতরে আলোচনার মাধ্যমেই ব্যাপারটা মিটে যেতো। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের উস্কানিতে ব্যাপারটা মিটলো না। রাশিয়াতেও সাজো সাজো রব পড়ে গেল। অষ্ট্রিয়া আর সার্ভিয়ার বিরোধে রাশিয়ার এতো মাথাব্যাথা শুরু হলো কেন, তা জানতে হলে পাঠকদের অতীতের দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া বলকান অঞ্চলের বসনিয়া ও হারজিগোভিনা দখল করে নেয়। এর ফলে বার্লিনের সন্ধি-সর্ত পদদলিত হয়। রাশিয়া তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলো না, তাই অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। কিন্তু এবার সে অনেকাংশে প্রস্তুত থাকায় অষ্ট্রিয়ার ওপর সে প্রতিশোধ নেবে বলে স্থির করে এবং তলে তলে সেনাবাহিনীকে সজ্জিত করতে থাকে। জারের আদেশে দশ লক্ষেরও বেশি সৈন্য রণসাজে সজ্জিত হয়।

রাশিয়ার এই রণসজ্জার পেছনে আরও একটি কারণ ছিল। এটি হলো রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা। আমরা আগেই বলেছি যে, রাশিয়ার অবস্থা তখন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে। জার তাই দেশের মানুষদের বিপ্লবী মনোভাবকে ভিন্ন পথে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্যেই জাতিকে যুদ্ধের দিকে টেনে নিতে চান। তাঁর ধারণা ছিল যে, জাতিকে যুদ্ধের মধ্যে টেনে আনতে পারলে আভ্যন্তরীণ অশান্তি আর থাকবে না। আসলেও তাই হলো। যুদ্ধের আহ্বান যখনই এলো তখনই জনসাধারণের বিপ্লবী মনোভাব যেন এক যাদুমন্ত্রবলে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ফিনল্যাণ্ড শান্ত হলো এবং জারের কাছ থেকে আত্মকর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি পেয়ে পোল্যাণ্ডও তার বিদ্রোহী মনোভাব পরিত্যাগ করলো।

রাশিয়া যখন রণসাজে সজ্জিত হচ্ছে তখন ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও রণসজ্জা শুরু হয়ে গেছে। কেন এটা হলো তা জানতে হলে মনীষী কার্লাইলের একটা মন্তব্য অনুধাবন করা দরকার। কার্লাইল বলেছিলেন, "ইয়োরোপে দুটি পরস্পর-বিরোধী বৈদ্যুতিক-শক্তি খেলা করছে। ভবিষ্যতে যে কোনো সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে এই দুই শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং পৃথিবীতে এক মহা প্রলয়ের স্থচনা হবে।"

মনীষী কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিস অ্যাঙ্গেলস-ও এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কাঁচা মালের জন্যে বিস্তৃত ভূভাগ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রির জন্যে বিস্তৃত বাজার বিশেষ প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার এটা একটা অপরিহার্য অঙ্গ।" তাঁরা আরও বলেছিলেন, "ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো সাম্রাজ্যবাদ। সুতরাং প্রত্যেক শিল্পোন্নত দেশই একদিন সাম্রাজ্যবাদী দেশে পরিণত হবে এবং সাম্রাজ্যবাদী বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেবে।"

এই তিনজন মনীষীর ভবিষ্যৎবাণী এবার সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অষ্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার কলহকে কেন্দ্র করে ইয়োরোপে যুদ্ধের আগুন জেলে দিলো। এরপর দেখা গেল যে, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সার্ভিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ একপক্ষে এবং জার্মানী, অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারী, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ অপরপক্ষে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশকে বলা হলো মিত্রপক্ষ। কিন্তু রাশিয়া কেন মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিলো সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা দরকার।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে মহাযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এই কয়টি বছরের মধ্যে রাশিয়া প্রভূত পরিমাণ বিদেশী মূলধন আমদানি করেছে এবং এই বিদেশী মূলধনের বেশির-ভাগই এসেছে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স হতে। রাশিয়ার বড়ো বড়ো শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাঙ্ক—সবই ছিলো হয় ইংল্যাণ্ড না হয় ফ্রান্সের অর্থে পুষ্ট। সুতরাং রাশিয়ায় শিল্পের প্রসার যতটা হয়েছিল, সম্পদের পরিমাণ ততটা বাড়েনি। মূলধন বিনিয়োগকারী ইংরেজ ও ফরাসী ধনিক সম্প্রদায়ই তখন রাশিয়ার অর্থনীতি তথা বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণ করেতো অথবা এ ব্যাপারে জার-সরকারকে প্রভাবিত করেতো। মুখ্যতঃ এই কারণেই রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলো।

এছাড়া কিছু গৌণ কারণও ছিলো। বলকানের খনিজসম্পদপুষ্ট প্রদেশগুলির ওপরে রাশিয়ার অনেকদিন থেকেই শ্যেনদৃষ্টি ছিলো। রাশিয়ার শিল্পপতিরা মনে করতেন, ওই সব বলকান অঞ্চলের প্রদেশকে কুক্ষিগত করতে পারলে রাশিয়ায় শিল্প আরও বেশি উন্নত হবে। পক্ষান্তরে জার মনে করতেন যে, এতে ভবিষ্যতে কোনো যুদ্ধ বাধলে রাশিয়া নিরপেক্ষ থাকতে পারবে। এই কারণেই রাশিয়া ওই সব প্রদেশকে দখল করবার সুযোগের সন্ধানে ছিল। এছাড়া দার্দানেলিসের ওপরেও রাশিয়ার প্রভুত্ব করবার বাসনা ছিলো। রাশিয়ার শাসকশ্রেণী জানতো যে, দার্দানেলিসের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমধ্যসাগরের ওপরেও তাদের কিছুটা অধিকার থাকবে। এবং এই অধিকার

প্রতিষ্ঠিত হলে রাশিয়ার বহির্বাণিজ্যের সুবিধে হবে। এই সব কারণেও রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগ দিয়েছিলো।

কিন্তু যুদ্ধ শুরু হবার কয়েক মাস পরেই রুশ-বাহিনী জার্মানদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯১৫ সালে মাজুরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে রাশিয়ার ত্রিশ হাজার সৈনিক নিহত এবং নব্বই হাজার সৈনিক বন্দী হয়।

রুশ-বাহিনীর এই পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, এটা সৈনিকদের অপদার্থতার জন্যে ঘটেনি—এটা ঘটেছিলো সাজ-সরঞ্জাম ও গুলি-বারুদের অভাবের জন্যে। রাশিয়ার অস্ত্র-শস্ত্রের অবস্থা কিরকম শোচনীয় ছিলো তার কিছু তথ্য এখানে দেওয়া হচ্ছে।

যুদ্ধ আরম্ভ হবার সময় রাশিয়ায় যতো সৈনিক ছিল, রাইফেলের সংখ্যা ছিল তার অর্ধেকেরও কম। বিভিন্ন কারখানায় যে হাজার হাজার শেল তৈরী হচ্ছিলো, সেগুলো যখন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হলো তখন দেখা গেল ওগুলো রাশিয়ার কামানগুলিতে ব্যবহারের অনুপযুক্ত। এছাড়া খাদ্য ও পোষাক-পরিচ্ছদ সরবরাহের অবস্থাও ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়।

কিন্তু এত সব অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও রুশ-বাহিনীর সৈনিকরা প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছিলো। কিন্তু জার্মানদের উন্নত অস্ত্র-শস্ত্রের সামনে তারা টিকতে পারলো না। জার্মান সেনাপতি ফন হিণ্ডেনবুর্গ-এর হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ-বাহিনীর এই পরাজয় একদিকে যেমন জার-সরকারের দুর্বলতাকে প্রকটিত করেছিলো, অন্যদিকে জনসাধারণ জার এবং তারসরকারের ওপর আগের চেয়ে বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এর ওপর আবার গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো এসে জুটেছিলো রাসপুটিন নামে এক লম্পট সাধু। এই লোকটা কিভাবে জার এবং তাঁর সরকারের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো সে কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে।

রাশিয়ার রাজনীতিতে রাসপুটিনের হস্তক্ষেপ ঃ

রাশিয়ার রাজনৈতিক আকাশে রাসপুটিনের আবির্ভাব অনেকটা ধূমকেতুর মতো। লোকে বলে, ধুমকেতু নাকি অশুভ বার্তার বাহক। রাসপুটিনও অশুভ বার্তাই বয়ে এনেছিলো। এই লোকটা কিভাবে জার এবং জারিনার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলো তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। কিন্তু কে এই রাসপুটিন? কেউ কেউ বলেন, সে নাকি একজন সিদ্ধপুরুষ, আবার কেউ কেউ বলেন, সে ছিলো একজন লম্পট। তার আসল নাম ছিল গ্রেগরী। লাম্পট্যের জন্যে সে তার গ্রাম হতে বিতাড়িত হয়। তখন থেকেই লোকে তার নাম দেয় রাসপুটিন। রাসপুটিন কথাটার অর্থ হলো লম্পট। আবার কারো কারো মতে সে ছিলো একজন যাদুকর এবং সম্মোহন বিদ্যায় পারদর্শী। তারা আরও বলতো যে, এই সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে সে-অনেক রকম দুরারোগ্য ব্যাধিও নিরাময় করতে পারতো।

যাই হোক, তার প্রকৃত পরিচয় নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে আমরা এখানে রাশিয়ার রাজপ্রাসাদে তার আবির্ভাব এবং জারিনার মাধ্যমে জারকে প্রভাবিত করবার কাহিনীই শুধু বিবৃত করছি। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন রাশিয়ার জারের একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিলো। পর পর চারটি মেয়েকে জন্মদান করে অবশেষে জারিনা এই পুত্রসন্তানটির জন্ম দেন। কিন্তু জন্মের পর থেকেই ছেলেটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। জার এবং জারিনা ছেলের জন্যে বহু অর্থ ব্যয় করে ইয়োরোপের বিখ্যাত চিকিৎসকদের দ্বারা ছেলের চিকিৎসা করান, কিন্তু কোনো চিকিৎসকই রাশিয়ার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীকে নিরাময় করতে পারেন না।

জার এবং জারিনা যখন ছেলের আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে পড়েছেন সেই সময় মস্কোর এক ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী একদিন জারিনাকে বলেন যে, তিনি যদি রাসপুটিনের ওপরে তাঁর ছেলের চিকিৎসার ভার দেন তাহলে রাজপুত্র নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করবেন। রাসপুটিন সম্বন্ধে সেই মহিলা আরও বলেন যে, তিনি একজন সন্নাসী এবং ঈশ্বর প্রেরীত ব্যক্তি।

এই কথা শুনবার পর জারিনা রাসপুটিনকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসেন এবং তার ওপরে ছেলের চিকিৎসার দায়িত্ব অর্পণ করেন। জারিনার অনুরোধে রাসপুটিন যুবরাজের চিকিৎসা শুরু করে এবং সম্মোহন শক্তির দ্বারা অথবা যে কোনো উপায়ে যুবরাজকে সে সাময়িকভাবে নিরোগ করতে সক্ষম হয়। সে তখন জারিনাকে বলে যে, যুবরাজকে স্থায়ীভাবে নিরোগ করতে হলে দীর্ঘ সময় তার চিকিৎসাধীনে রাখা দরকার। জারিনা রাসপুটিনের কথায় সম্মত হন এবং তাকে রাজপ্রাসাদে থেকে ছেলের চিকিৎসা করতে বলেন। এইভাবে রাসপুটিন রাশিয়ার রাজপ্রাসাদে থাকবার সুযোগ লাভ করে।

এখানে জারিনা সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। বিয়ের আগে ইনি ছিলেন জার্মানীর অন্তর্গত হেন-এর রাজকুমারী। ছেলেবেলা থেকেই ইনি ছিলেন অমিতাচারীনী। বিয়ের পর তাঁর এই অমিতাচারী স্বভাবটা আরও বেড়ে যায়। এটা সম্ভব হয়েছিলো জারের দুর্বল স্বভাবের জন্যে। জার ছিলেন সরল ও দুর্বলচিত্ত। পক্ষান্তরে জারিনা ছিলেন কূটবুদ্ধিসম্পন্না এবং দৃঢ়চিত্ত। এ রকম অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে যা হয়ে থাকে, এখানেও তাই হলো। অর্থাৎ জার তাঁর স্ত্রীর হাতের পুতুল হয়ে পড়লেন।

স্বামীকে বশীভূত করবার পর জারিনা রাশিয়ার রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। সে সময় রাশিয়ার অবস্থাটা ছিল রীতিমত অগ্নিগর্ভ। যেখানে সেখানে ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং বিদ্রোহ সংঘটিত হচ্ছে। কিন্তু জারিনা তাতে আদৌ বিচলিত হননি। তিনি জারকে পরামর্শ দিয়েছেন যে, না-খেতে-পাওয়া ছোটোলোকদের তিড়িং-বিড়িং নাচ দেখে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই। পুলিশ দিয়ে ওদের আচ্ছা করে ধোলাই দিলেই বাছাধনরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। জারও তাঁর বিদুষী ও সুন্দরী পত্নীর এই সুপরামর্শকে গ্রহন করে ধোলাই পদ্ধতিই অবলম্বন করেন।

জার যে তাঁর পত্নীর দ্বারা চালিত হচ্ছিলেন একথাটা জনসাধারণও জানতো। তাই জারিনার ওপর তাদের ছিল অপরিসীম ঘৃণা ও আক্রোশ।

ঠিক এই সময়েই রাসপুটিন এসে যুবরাজের চিকিৎসার ভার গ্রহন করে এবং জারিনার কথামতো রাজপ্রাসাদে বাস করতে থাকে। এই সময় জারিনার সঙ্গে রাসপুটিনের হৃদ্যতা এতো বেড়ে যায় যে, রাজপ্রাসাদের অধিবাসীদের চোখেও সেটা সন্দেহজনক মনে হতে থাকে। জারিনা কিন্তু কে কি ভাবছে তা গ্রাহ্যও করলেন না। ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, রাজমাতা মেরীও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি তখন জারকে বললেন যে, রাসপুটিনকে যদি প্রাসাদ থেকে দূর করে না দেওয়া হয় তাহলে তিনি আর ওখানে থাকবেন না। জার কিন্তু তাঁর মায়ের কথাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলেন না। রাজমাতা এতে নিজেকে অপমানিতা বোধ করে ক্রিমিয়ায় চলে গেলেন। রাসপুটিন কিন্তু বহাল তবিয়তেই রয়ে গেল।

এই ব্যাপারে রাসপুটিন বুঝতে পারলো যে, জারিনা সম্পূর্ণরূপে তার হাতের মুঠোয় এসে গেছেন। সে তখন রাষ্ট্রশাসনেও হস্তক্ষেপ করতে শুরু করলো। কিন্তু রাষ্ট্রশাসনের ব্যাপারে তার এই হস্তক্ষেপ অনেকের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠলো। এদিকে জনসাধারণও রাসপুটিন সংক্রান্ত ব্যাপারে জারিনার ওপরে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলো। তারা প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে শুরু করলো যে, জারিনা রাসপুটিনের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন। জনসাধরণের এই ধরনের কথাবার্তা শুনে আর্চবিশপ এণ্টনি একদিন একথা জারের কর্ণগোচর করলেন। তাঁর কথা শুনে জার ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন যে, জার এবং জারিনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যেন কোনো কথা না বলেন। জারের মুখ থেকে এই কথা শুনে আর্চবিশপ ক্ষুন্ন মনে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু চাপা রইলো না। প্রথমে কানাঘুষা চললো, পরে খবরের কাগজেও এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো। অবশেষে ডুমার ভেতরেও রাসপুটিন সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলো। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। বরং রাসপুটিন সম্বন্ধে যারাই বিরূপ মন্তব্য করলেন তাঁদেরই রাজরোষে পড়তে হলো।

তখন মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। রাসপুটিন তখন যুদ্ধের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ

করতে লাগলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, রাসপুটিনই যেন রুশ-সাম্রাজের কর্তা। মন্ত্রী হতে আরম্ভ করে সামান্য বেতনের কর্মচারিও তার ইচ্ছায়ই নিযুক্ত অথবা অপসারিত হতো। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সাজোনফ্ রাসপুটিনকে ঘৃণা করতেন, ফলে তিনি পদচ্যুত হলেন এবং তাঁর জায়গায় নিযুক্ত হলেন স্টুরমার নামে রাসপুটিনের একজন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।

এই সময় রাসপুটিন একদিন জারিনার কাছে আব্দার জানায় যে, সে রণক্ষেত্রে গিয়ে সৈনিকদের আশীর্বাদ জানাতে চায়। জারিনা তখন জারকে দিয়ে প্রধান সেনাপতির কাছে খবরটা পাঠান। এর উত্তরে প্রধান সেনাপতি বলে পাঠান যে রাসপুটিন যুদ্ধক্ষেত্রে গেলে তাকে গুলি করে মেরে ফলা হবে। প্রধান সেনাপতি বড়ো যে-সে লোক ছিলেন না। তিনি ছিলেন রাশিয়ার গ্র্যাণ্ড ডিউক। কিন্তু তাহলে কি হয়? রাসপুটিনের প্রতি অসৌজন্যমূলক কথা বলার ফলে জার তাঁকে পদচ্যুত করলেন।

এই সব ব্যাপারে দেশের প্রতিটি লোকই রাসপুটিনের ওপর বিরূপ হয়ে উঠলো। এমনকি, রাজপরিবারের লোকেরাও তাকে ঘৃণা করতে লাগলো। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ তখন রাসপুটিনকে হত্যা করতে সচেষ্ট হলেন।

এর কিছুদিন পরে, অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রাজধানীর লোকেরা শুনতে পেলো যে, রাসপুটিনকে কে বা কাহারা হত্যা করেছে। পরে আরও শোনা গেল যে, রাজপরিবারের কয়েকজন যুবক এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

রাসপুটিনের এই হত্যার সংবাদটি জানতে পেতে রাশিয়ার জনসাধারণ যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তাদের মনে হলো রাশিয়া একটা দানবের হাত থেকে মুক্তিলাভ করলো।

জারিনা কিন্তু এতেও শিক্ষালাভ করলেন না। তিনি অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন এবং জারকে দিয়ে এই ব্যাপারে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের নির্বাসিত করলেন।

এতক্ষণ আমরা রাসপুটিন সম্বন্ধে আলোচনা করে আমাদের আসল বক্তব্য, অর্থাৎ 'গণ-বিপ্লবের আয়োজন'-এর প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। আবার আমরা সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসছি।

গণ-বিপ্লবের প্রস্তুতি ঃ

যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ-বাহিনীর বিপর্যয় একদিকে যেমন রুশ-সাম্রাজ্যের নৈতিক মেরুদণ্ড শিথিল করে দিয়েছিলো, অন্যদিকে জনসাধারণও জার এবং তাঁর সাঙ্গ-পাঙ্গদের ওপর প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এই বিক্ষোভ আরও বাড়িয়ে তুলেছিলো রাশিয়ার তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ভদ্রলোক স্থান কাল বিস্মৃত হয়ে জনসাধারণের বুকের ওপর দিয়ে অত্যাচারের রথ চালিয়ে চলেছিলেন।

এদিকে রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থাও তখন বিপর্যয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করাই সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে। ব্যাপার দেখে জার-সরকার 'সমর-ঋণ' চালু করতে চাইলেন। কিন্তু তৎকালীন আইন অনুসারে এই ধরণের কোনো ঋণপত্র চালু করতে হলে ডুমার অনুমতি প্রয়োজন ছিলো। সরকার তাই বাধ্য হয়ে ডুমার কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রার্থনা করলো। ডুমার বলশেভিক সদস্যরা এর বিপক্ষে ভোট দিলেন। ফলে তাদের মধ্যে অনেককে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হলো। বলশোভিক নেতারা কিন্তু এতে দমে গেলেন না। তারা তখন গোপনে গোপনে জারের উচ্ছেদ সাধনের জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁরা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করতে লাগলেন যে, বুর্জোয়া ও প্রলেটারিয়েটের ভেতরে কোনো রকম সহযোগিতাই সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে জার সরকারও শ্রমিকদের হাত করবার জন্যে নানা রকম উপায় অবলম্বন করলো। তারা একশ্রেণীর তথাকথিত শ্রমিক প্রতিনিধিকে দলে টেনে তাদের দিয়ে একটি কমিটি গঠন করালো। এই কমিটির সদস্যরা বলে বেড়াতে লাগলো যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ধর্মঘট করা উচিত হবে না। কিন্তু তাদের এই ধরনের দালালী কথায় শ্রমিকরা

আদৌ কান দিলো না, উপরন্ত দালালদের তাঁরা প্রকাশ্যেই ঘৃণা করতে লাগলো। শ্রমিকদের কাছে এইভাবে ঘৃণিত হয়ে দালাল নেতারা আর মুখ খুলতে সাহসী হলো না।

স্থায়ী শিল্পের অবনতি ও যুদ্ধ-শিল্পের প্রসার ঃ

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন রাশিয়ার শিল্প সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় যে, রাশিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই জানা যায় যে, সে সময় শুধু যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম তৈরীতে নিয়োজিত শিল্পেরই উন্নতি হয়েছিলো। জনগণের প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যাদির উৎপাদন একেবারেই কমে গিয়েছিলো। অর্থাৎ যে সব শিল্পের উন্নতিতে দেশ সমৃদ্ধ হয় সে সব শিল্প ক্রমাগত অবনতির পথেই চলেছিলো।

স্থায়ী শিল্পের অবনতি এবং যুদ্ধশিল্পের প্রসারের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিলো। যুদ্ধ-শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিদের সংখ্যা স্থায়ী শিল্পের শ্রমিক সংখ্যার চেয়ে অনেক কম হওয়াতেই এটা হয়েছিলো। বলশেভিক নেতারা এর সুযোগ গ্রহন করতে ভোলেননি। তাঁরা শ্রমিকদের এই দুর্গতির কারণ তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে তাঁদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালাতে থাকেন।

যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিলো। বলশেভিক নেতারা তাঁদের মধ্যেও যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার শুরু করেন। ফলে কৃষকরাও বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। এই সময় বলশেভিকরা তাঁদের প্রধান কার্যালয় ও প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করলেন। কাজের সুবিধের জন্যেই এটা করা হলো।

সৈনিকদের মধ্যে প্রচার ঃ

সৈনিকদের মধ্যেও বলশেভিকরা প্রচার শুরু করেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেনাবাহিনী যদি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে গণ-বিপ্লবকে সাফল্যমণ্ডিত করা কঠিন হয়ে উঠবে। তাঁরা তাই আর কালবিলম্ব না

করে সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লববাদ প্রচার শুরু করলেন। তাদের এই প্রচার শুধু সেনা-ব্যারাকগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইলো না ; যে সব প্রদেশ হতে জার সরকার সৈনিক সংগ্রহ করতো সে সব প্রদেশে গিয়ে তাঁরা বাড়িতে বাড়িতে প্রচার করতে লাগলেন। সৈনিকদের এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজনদের তাঁরা বুঝিয়ে দিলেন যে, এই যুদ্ধে তাঁদের কোনো স্বার্থ নেই। যে সব লোককে হত্যা করবার জন্যে তাঁদের নিয়োজিত করা হচ্ছে তারাও তাঁদেরই মতো গরিব মানুষ। এছাড়া জার-সরকারের জনবিরোধী ক্রিয়া-কলাপের কথাও তাঁরা সৈনিকদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

এই সব প্রচারের ফলে সৈনিকদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিলো। ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, কোনো কোনো জায়গায় সৈনিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে অস্বীকার করলো। দুচারজন সেনানায়ককেও তারা হত্যা করলো।

এখানে আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার যে, শুধু বলশেভিকদের প্রচারই সৈনিকদের যুদ্ধ-বিরোধী করে তোলেনি ; উপযুক্ত খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের অভাবেও তাদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিলো।

বলশেভিক নেতারা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন এবং সৈনিকদের মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ছাত্র-সমাজের অবস্থা ঃ

রাশিয়ার ছাত্র-সমাজ প্রথম থেকেই বিপ্লবের পক্ষে ছিলেন। বলাবাহুল্য যে, বিপ্লবী নেতাদের প্রচারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিলো। তাঁরা প্রতিটি শিক্ষায়তনে বিপ্লবী ছাত্রসংস্থা গঠন করে ছাত্র সমাজকে বিপ্লবের পথে টেনে এনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এমন অস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো যে, ছাত্ররা আর অপেক্ষা করতে চাইছিলো না। গণ-বিপ্লবের জন্যে তারা একেবারে অধীর হয়ে উঠেছিলো।

মহাযুদ্ধে শুরু হতেই সেন্টপিটার্সবুর্গের নাম পরিবর্তন করে পেট্রোগ্রাদ রাখা হয়। বর্তমানে এটা লেনিনগ্রাদ নামে বিখ্যাত।

দেশের অবস্থা যখন এই রকম ঠিক সেই সময়েই বলশেভিক নেতারা দেশবাসীকে সশস্ত্র-বিপ্লবের আহ্বান জানালো।

ছাত্রদের এই রকম মনোভাব দেখে পুলিশের গুপ্তচর বিভাগ গোপন-রিপোর্ট পাঠিয়ে সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলো যে, ছাত্র-সমাজ যে কোনো মুহূর্তে বিপ্লব শুরু করতে পারে এবং ছাত্ররা যদি বিপ্লব শুরু করে তাহলে শ্রমিকরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেবে। গুপ্তচর বিভাগ আরও বলেছিলো যে, ছাত্র ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের এই মিলন জার সরকারের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মার্চ বিপ্লব

চারদিকে অশান্তি নিয়ে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষ দেখা দিল। এবারের নববর্ষ জারের জন্যে কোনো মঙ্গলবার্তা বহণ করে আনলো না। সমগ্র রাশিয়া তখন অগ্নিগর্ভ। যে কোনো মুহূর্তে সে আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। দেশে তখন নিদারুণ খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। ফলে জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। যে সব সরকারী কর্মচারি খাদ্য সরবরাহের সঙ্গে যুক্ত ছিলো তারা তখন জনসাধারণ কর্তৃক পদে পদে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হচ্ছে। মোটকথা রাশিয়ায় তখন গণ-অসন্তোষ এবং গণ-বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠেছে। কিন্তু এই গণ বিক্ষোভের পেছনে যে বিরাট এক বিপ্লবী শক্তি নীরবে কাজ করে চলেছে তা বুঝবার মতো দূরদৃষ্টি জার সরকারের ছিলো না। তারা ভেবেছিলো হয়তো বড় রকমের একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধতে পারে অথবা এখানে-সেখানে দু-চারটে ধর্মঘট হতে পারে। তারা তাই পুলিশ-বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলো

যে, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে অথবা ধর্মঘট হলে দাঙ্গাকারী ও ধর্মঘটকারী মানুষদের পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে হবে।

বিপ্লবের পূর্বাভাষ ঃ

এমনি থমথমে অবস্থার মধ্যেই জানুয়ারীর প্রথম তিন সপ্তাহ কেটে গেল। চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতেই (অর্থাৎ ২২ শে জানুযারী) পেট্রোগ্রাদের প্রায় তিন লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করলো। সাথে সাথে মস্কো, খারকভ এবং বাকুতেও ধর্মঘট শুরু হলো। পেট্রোগ্রাদের ছাপাখানাগুলি ধর্মঘটের ফলে বন্ধ থাকায় কয়েকখানা সংবাদপত্র প্রকাশিত হলো না।

২৫ শে জানুয়ারী ডুমার অধিবেশন শুরু হবার কথা ছিলো। কিন্তু পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ায় জার ঘোষণা করলেন, ডুমার অধিবেশন শুরু হবে ২৭শে ফেব্রুয়ারী।

১২ই ফেব্রুয়ারী 'ওয়ার ইণ্ডাষ্ট্রিজ কমিটির' কয়েকজন সদস্যকে জার সরকারের আদেশে গ্রেপ্তার করা হলো। এই সদস্যরা আদৌ বিপ্লবী ছিলেন না। কিন্তু কতকগুলো ভুল ধারনার বশবর্তী হয়েই সরকার এদের গ্রেপ্তার করবার আদেশ দিয়েছিলো।

এ দিকে রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ ইস্পাত শিল্প পুটিলভ্ ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরা হঠাৎ ধর্মঘট করে কারখানা থেকে বেরিয়ে এলো। ধর্মঘটী শ্রমিকরা অন্যান্য কারখানার সামনে গিয়ে সে সব কারখানায় শ্রমিকদের ধর্মঘটের সামিল হতে অনুরোধ করলো। এর ফলে অন্যান্য কারখানাতেও ধর্মঘট হলো।

কারখানাগুলোয় তখন প্রতিদিন সভা হচ্ছে। এইসব সভায় প্রকাশ্যেই সরকারের সমালোচনা করা হচ্ছে। শ্রমিকদের এই মনোভাব শাসকশ্রেণীর অসহ্য হয়ে উঠলো। তারা তখন দমন-নীতি প্রয়োগ করে শ্রমিকদের সায়েস্তা করতে কৃতসংকল্প হলো। জারের আদেশে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পেট্রোগ্রাদে সেনাদল আমদানি করা হলো। বিভিন্ন সরকারী ভবনের এবং সরকারের সমর্থক ধনী ব্যক্তিদের বাড়ির ছাদে ছাদে মেশিনগান বসানো হলো।

২৭ শে ফেব্রুয়ারী ডুমার অধিবেশন বসার কথা ছিল। কিন্তু ওই দিন সকালেই স্টাট কারখানা হতে প্রায় দশ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে বেরিয়ে এলো। ধর্মঘটী শ্রমিকরা লাল ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে বিপ্লবী সঙ্গীত গাইতে গাইতে মিছিল বের করলো। মিছিলে মুহুর্মুহু ধ্বনি উঠতে লাগলো—"সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অবসান হোক, আমরা যুদ্ধ চাইনে, শান্তি চাই"। এই অবস্থার মধ্যেই ডুমার অধিবেশন শুরু হলো।

মার্চ-১৯১৭

৩রা মার্চ পর্যন্ত শ্রমিকদের শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণ ছিলো। ওই দিন(৩রা মার্চ) সমস্ত কারখানায় শ্রমিকদের সভা হলো। এতদিন শ্রমিকরা শুধু অর্থনৈতিক দাবির মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলো; ৩রা মার্চের সভাগুলিতে শ্রমিকরা রাজনৈতিক দাবি জানালো। কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের বরখাস্ত করার ভয় দেখিয়ে বললেন, শ্রমিকরা যদি সংযত না হয় তাহলে তাঁরা কারখানাগুলো বন্ধ করে দেবেন। পরদিন (অর্থাৎ ৪ঠা মার্চ) শ্রমিকরা অশান্ত হয়ে উঠলো। খাদ্যদ্রব্যের বিতরণ কেন্দ্রগুলিতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হলো। খাদ্যদ্রব্য লুণ্ঠিত হতে লাগলো।

৬ই মার্চ বহুসংখ্যক পাউরুটির কারখানা ও মুদী-দোকান লুণ্ঠিত হলো।

৭ই মার্চ অনেকগুলি কারখানার মালিকরা তাঁদের কারখানাগুলো অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দিলেন। কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ওই সব কারখানার শ্রমিকরা দলে দলে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন।

৮ই মার্চ প্রায় নব্বই হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করে কারখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। ওই দিন নারী শ্রমিকরাও এক বিরাট শোভাযাত্রা বের করলেন। তাঁরা রক্ত পতাকা হাতে নিয়ে খাদ্য দ্রব্যের দাবী জানাতে জানাতে টাউন হলের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। অনেকগুলো ফেস্টুনও ছিলো সেই নারী শোভাযাত্রায়। তাতে লেখা ছিলো—"অবিলম্বে যুদ্ধের 'অবসান হোক"—"আমরা যুদ্ধ চাইনে—শান্তি চাই"—"স্বেচ্ছাচারী জার সরকার নিপাত যাক"।

বিকেল চারটের সময় হঠাৎ একদল অশ্বারোহী পুলিশ এবং একদল পদাতিক পুলিশ শোভাযাত্রীদের সামনে এসে তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালো। তাদের কাঁধে ঝুলানো রাইফেল আর হাতে চাবুক।

এর পরেই শুরু হলো এক বীভৎস ব্যাপার। শোভাযাত্রীদের কোনো রকম সাবধান না করেই তারা যথেচ্ছ চাবুক চালাতে শুরু করলো। জনতা কিন্তু এতেও বিচলিত হলো না। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে লাগলো। শত শত নারী সেদিন পুলিসদের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত দেহে ঘরে ফিরলেন।

পরদিন প্রায় দুই লক্ষ শ্রমিকের এক বিরাট শোভাযাত্রা বের হলো। এদিনের শোভাযাত্রীরা কিন্তু গতকালের শোভাযাত্রীদের মতো নিরস্ত্র ছিলো না। তাঁদের হাতে ছিলো লোহার ডাণ্ডা আর লাঠি। মনে হলো, জনতা আজ পুলিশদের মোকাবিলা করবার প্রতিজ্ঞা নিয়েই বেরিয়েছে। সেদিনও যথারীতি পুলিশবাহিনী এসে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের আক্রমণ করলো। শুরু হয়ে গেল জনতা আর পুলিশে খণ্ডযুদ্ধ। পুলিশরা সশস্ত্র হলেও জনতার অনুপাতে তাদের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। তাই জনতার কাছ থেকে মার খেয়ে তারা দ্রুত পলায়ন করলো।

পুলিশদের এইরকম দুর্গতির পর তাদের জায়গায় এসে গেল একদল কসাক সৈনিক। তারা এসেছে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে। তাদের দেখে শোভাযাত্রীরা বেশ কিছুটা দমে গেল। সৈন্যাধ্যক্ষ সৈনিকদের আদেশ দিলেন— "হঠাও এদের!" সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশে কসাক সৈনিকরা খোলা তরোয়াল হাতে জনতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কসাকরা আক্রমণ করছে দেখে শোভাযাত্রীরা ভীত হয়ে পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই তারা দেখতে পেলো যে, সৈনিকরা কাউকে আঘাত করছে না; তারা তাদের ঘোড়াগুলিকে সুকৌশলে জনতার ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখে মৃদু হাসি এবং চোখে সহানুভূতির দৃষ্টি।

কসাক সৈনিকদের কাছ থেকে এই রকম সহানুভূতি লাভ করে শ্রমিকরা উৎসাহিত হয়ে উঠলো। তারা তখন সহস্রকণ্ঠে সৈনিকদের অভিনন্দন জানাতে লাগলো। ব্যাপার দেখে সৈন্যাধ্যক্ষ রেগে গিয়ে আবার আক্রমণ করবার আদেশ দিলেন। কসাকরাও আক্রমণ করলো। কিন্তু সে আক্রমণ হলো প্রথমবারের মতোই আক্রমণের অভিনয়। তাদের মুখে ঠিক আগেরই মতো মৃদু হাসি, চোখেও আগের মতোই সহানুভূতির দৃষ্টি।

সৈন্যাধ্যক্ষ তখন শোভাযাত্রীদের গতিরোধ করবার জন্যে সৈনিকদের আদেশ দিলেন। সৈনিকরাও তাঁর আদেশ পালন করলো। তারা শোভাযাত্রীদের পথরোধ করে দাঁড়ালো। শ্রমিকরা তখন তাদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা শুরু করলো। এরপর দেখা গেল, শ্রমিকরা কসাকদের ঘোড়াগুলোর পেটের নিচ দিয়ে রাস্তার বাধা অতিক্রম করছে। কসাকরা তাদের বাধা তো দিলোই না, উপরন্তু হাসিমুখে তাদের উৎসাহ দিতে লাগলো। শ্রমিকরা তখন কসাকদের বাধা অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। কসাকরাও তাদের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে শ্রমিকদের শোভাযাত্রা লক্ষ্য করতে লাগলো। শ্রমিকরা কিছুদূর এগোতেই একদল সশস্ত্র পুলিশ তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। শ্রমিকরা তাদের কসাকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার জন্যে অনুরোধ জানালো। পুলিশদল তখন কসাকদের দিকে তাকালো। কসাকদের হাবভাব দেখে তাদের মনে হলো যে, তারা যদি শ্রমিকদের আক্রমণ করে তাহলে কসাকরা হয়তো তাদের আক্রমণ করবে। এই কথা চিন্তা করে তারা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রাকে এগিয়ে যেতে দিলো।

শোভাযাত্রা আরও কিছুদূর এগোলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র এসে শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করতে লাগলো। এই সময় একদল বল্লমধারী সৈনিক এসে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। শোভাযাত্রীরা তাদেরও কসাকদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে অনুরোধ করলো। বল্লমধারী সৈনিকরা সভয়ে লক্ষ্য করলো যে, কসাকরা তাদের দিকে রাইফেল তাক করে এগিয়ে আসছে।

ব্যাপার দেখে ঘাবড়ে গিয়ে তারাও পুলিশদের মতো পশ্চাদপসরণ করলো। শোভাযাত্রা এগিয়ে চললো।

পরদিন ১০ই মার্চ পুনরায় শোভাযাত্রা বের হলো। সেদিনও কসাকরা তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। এই সময় জনতার ভেতর থেকে বিপ্লবীরা সামনে এগিয়ে এসে কসাকদের এই বিপ্লবে প্রকাশ্যভাবে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধ জানালেন। বিপ্লবীদের আহ্বানে কসাকরা বিচলিত হয়ে উঠলো। ঠিক এই সময় একদল অশ্বারোহী পুলিশ এসে শোভাযাত্রীদের আক্রমণ করলো। শোভাযাত্রীরা এই ধরণের আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। এই আক্রমণের ফলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

এদিকে কসাকরাও তখন তাদের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। তারা তখন আক্রমণকারী সৈনিকদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ব্যাপার গুরুতর দেখে পুলিশ পুঙ্গবরা 'য পলায়তি স জীবতি' নীতিবাক্যটি অনুসরণ করে ওখান থেকে দ্রুত পলায়ন করলো। এরপর কসাকরাও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে শ্রমিকদের সঙ্গে এগিয়ে চললো। জারের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন কসাকরাই সর্বপ্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। শোভাযাত্রীরা বিপুল উৎসাহে এগিয়ে চললো। ইতিমধ্যে বিভিন্ন শহর হতে আরও অনেক শ্রমিক এসে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও এসেছে।

কিছুদূর এগোবার পর শোভাযাত্রীরা দেখতে পেলেন যে, আর একদল সৈনিক তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওইভাবে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নারী শোভাযাত্রীরা এগিয়ে এসে বললে—"বন্ধুগণ! কার স্বার্থে আপনারা আমাদের বাধা দিতে এসেছেন? তাকিয়ে দেখুন কসাকরা আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। আপনারাও তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুন। আমাদের সঙ্গে যোগ দিন।"

বিপ্লবী নারীদের এই আহ্বান সৈনিকরা উপেক্ষা করতে পারলো না তারা একে অন্যের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। তাদের চোখে চোখে কি

বার্তা বিনিময় হলো কে জানে! হঠাৎ দেখা গেল, তারা বেয়নেট খুলে ফেলে রাইফেল কাঁধে ফেলছে। শোভাযাত্রীরা আনন্দে জয়ধ্বনি করে উঠলো। সৈনিকরা শোভাযাত্রীদের সঙ্গে মিশে গেল। শোভাযাত্রীরা তখন দ্বিগুণ উৎসাহে এগিয়ে চললো পেট্রোগ্রাদের প্রধান রাজপথে নেভ্‌স্কিপ্রস পোস্টের দিকে।

ওখানে আসতেই জনতা আর একদল সৈনিকের সম্মুখীন হলো। তাদের দেখে শোভাযাত্রীদের মনে হলো যে, ওরাও হয়তো শোভাযাত্রায় যোগ দেবে। শোভাযাত্রীরা তাই ওদের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবার জন্যে অনুরোধ করলো। কিন্তু ওরা শোভাযাত্রীদের কথায় কান না দিয় তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো। সৈনিকদের এই অপ্রত্যাসিত আক্রমণে শোভাযাত্রীরা দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলো। সৈনিকরা তখনও গুলিবর্ষণ করে চলেছে। ওদের গুলির আঘাতে শত শত নরনারী পথের ওপর লুটিয়ে পড়তে লাগলো। আহত নরনারীর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠলো।

কসাক এবং অন্যান্য সৈনিকরা তখন শোভাযাত্রার পেছন দিকে ছিলো। জারের সৈনিকরা শোভাযাত্রীদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে দেখে তারা রাইফেল উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। তাদের ক্রুদ্ধ চেহারা দেখে পূর্বোক্ত সৈনিকরা ভয় পেয়ে গুলিবর্ষণ বন্ধ করলো। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। রাজপথ শ্রমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে।

পরদিন সকালে আবার মিছিল বের হলো। জার সরকারও এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো। পুলিশ ও সেনাবাহিনীকে সরকার নির্দেশ দিয়েছিলো যে, যেমন করেই হোক, মিছিল বন্ধ করতে হবে। সরকারের নির্দেশে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পথে পথে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলো।

মিছিল শহরের মধ্যে প্রবেশ করলে বিভিন্ন বাড়ির ছাদ থেকে মেসিন গানের গুলিবর্ষণ শুরু হলো। পুলিশ এবং সৈনিকদলও এগিয়ে এসে গুলিবর্ষণ শুরু করলো। এই অমানুষিক আক্রমনের ফলে শত শত শ্রমিক ও ছাত্র নিহত হলো। আহতের সংখ্যা আরও বেশি। অ্যাম্বুলেন্সের গড়িগুলি মৃত ও আহত

সৈনিকদের রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গেল, বাকি মিছিলকারী জনতা এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা হাতের কাছে যা পেলো তাই নিয়েই আক্রমনকারীদের মোকাবিলা করতে ছুটলো। কিন্তু রাইফেলধারী পুলিশ আর সৈনিকদের সঙ্গে তারা পেরে উঠবে কেন? তারা দলে দলে প্রাণ দিতে লাগলো।

ব্যপার দেখে বিপ্লবী নেতারা সেদিনের মিছিল বন্ধ করে দিলেন। জনতা অনেকটা ক্ষুণ্ন মনেই সেদিন যে যার বাড়িতে ফিরে গেল।

বিপ্লবী নেতারা তখন এক গোপন সভায় মিলিত হয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনায় বসলেন। আলোচনায় স্থির হলো যে, নিরস্ত্র শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল বের করা ঠিক হবে না। শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হবে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে অস্ত্র? শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিতে হলে হাজার হাজার রাইফেল আর গুলিবারুদ চাই। কোথায় তা পাওয়া যাবে?

এই প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনার পর স্থির হলো যে, বিপ্লবী নেতারা সেই রাত্রেই বিভিন্ন সেনা-ব্যারাতে গিয়ে সৈনিকের সঙ্গে আলোচনা করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা স্থির করবেন।

সেই রাত্রেই বিপ্লবী নেতারা বিভিন্ন সেনা-ব্যারাতে গিয়ে সৈনিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। তাঁদের আলোচনা ফলপ্রসূ হলো। সৈনিকরা তাঁদের কথা দিলো যে, আগামীকাল থেকে তারা বিপ্লবী দলে যোগ দেবে।

পরদিন ১২ই মার্চ সকাল থেকে এক নতুন দৃশ্য দেখা গেল। সৈনিকেরা সেদিন বিপ্লবী শ্রমিকদের সঙ্গে একযোগে পেট্রোগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে বেড়াচ্ছে। জনতা সেদিন আর আগের মতো নিরস্ত্র নয়। সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগারে যে সব রাইফেল ও গুলিবারুদ ছিলো সেগুলো এসে গেছে শ্রমিকদের হাতে।

দুপুরের আগেই সারা পেট্রোগ্রাদ শহর যেন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিনত হলো। জনতা আজ বে-পরোয়া। অস্ত্র হাতে পেয়ে তারা সেদিন জার-সরকারের পুলিশ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্যে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

ব্যাপারটা যে, এতটা গুরুতর হয়ে উঠবে তা সরকারী কর্তৃপক্ষ ধারনাও করতে পারেন নি। ব্যাপারটা তাঁরা বুঝতে পারলেন গুপ্তচর বিভাগের জরুরী রিপোর্ট পেয়ে। রিপোর্টে বলা হয়েছিলো যে, সেনাবাহিনী বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছে।

এদিকে জনতা তখন সরকারী ভবনগুলিতে অগ্নিসংযোগ করতে শুরু করেছে। আদালতগুলিতেও অগ্নিসংযোগ করা হলো। সরকারী সম্পত্তি রক্ষা করার জন্যে পুলিশ-বাহিনী এগিয়ে আসতেই জনতা তাদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করলো। যে সব সৈনিক তখনও বিপ্লবীদের দলে যোগ দেয়নি জনতা তাদেরও আক্রমণ করলো। তাদের অক্রমণে বহু সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হলেন। সেনা-ব্যারাকগুলোও বিপ্লবীদের হস্তগত হলো। পেট্রোগ্রাদের সুবৃহৎ কারাগারের দরজা ভেঙে কয়েদীদের মুক্তি দেওয়া হলো। কয়েদীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে বিপ্লবীদের দলে যোগ দিলো। এরপর জেলখানায় আগুণ লাগিয়ে দেওয়া হলো।

পেট্রোগ্রাদের এই বিপ্লবের খবর দাবানলের মতো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ফলে অন্যান্য জায়গাতেও এই ধরণের ঘটনা ঘটতে লাগলো। বিপ্লবী নেতাদের কাছে খবর এলো যে, রাশিয়ার বৃহত্তম হারবার ক্রোনষ্টাড বিপ্লবীদের হাতে এসেছে। ওখানে জারের যে সেনাবাহিনী ছিল, সেই বাহিনীর সৈনিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে বিপ্লবে অংশগ্রহন করেছে।

পরদিন (১৩ই মার্চ) নেতাদের কাছে যে সব খবর এসে পৌছাতে লাগলো তা থেকে তাঁরা জানতে পারলেন যে, রাশিয়ার সর্বত্রই বিপ্লবীরা সাফল্যলাভ করেছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জারের সিংহাসন ত্যাগ

পেট্রোগ্রাদে যখন বিপ্লবের আগুন জলছে তখন জার ও জারিনার সংবাদ জানতে পাঠকদের নিশ্চয়ই আগ্রহ হবে। আমরা তাই বর্তমান পরিচ্ছেদে জার এবং জারিনার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা করছি।

পেট্রোগ্রাদে যখন বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈন্যেরা মার্চ করে বেড়াচ্ছেন সেই সময় জার ছিলেন মহিলেভ শহরে। তিনি ওখানে গিয়েছিলেন সেনাপতিদের সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থা আলোচনা করতে। এদিকে জারিনা তখন তাঁর বিরামকুঞ্জে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করছিলেন। এই জায়গাটা ছিল পেট্রোগ্রাদ থেকে ১৯ মাইল দূরে।

এদিকে পেট্রোগ্রাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠতেই পুলিস-প্রধান এবং আরও অনেকে তার যোগে জারকে ওখানকার অবস্থা জানিয়ে দিলেন। জার কিন্তু ব্যাপারটার গুরত্ব অনুধাবন করতে পারলেন না। তাঁর মনে হলো যে, ওখানে হয়তো ব্যাপকভাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। তাঁর আরও মনে হলো যে, জারিনা এবং সেনা বাহিনী নিশ্চয়ই দাঙ্গাকারীদের সায়েস্তা করতে পারবে। পরবর্তী চিন্তাধারায় তাঁর মনে আর একটা ধারণার সৃষ্টি হলো, তিনি ভাবলেন যে, এই সব অশান্তির জন্যে ডুমার সদস্যরাই দায়ী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি ১১ই মার্চ মহিলেভ থেকে তার যোগে ডুমার সভাপতি রড্‌জিয়াস্কোকে জানিয়ে দিলেন যে, ডুমা বাতিল করা হলো। জারের এই তারবার্তা হাতে আসতেই সভাপতি ডুমার সদস্যদের নিয়ে এক জরুরী সভায় বসলেন। সারা রাত ধরে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবার পর ডুমা সিদ্ধান্ত নিলো যে, জারের নির্দেশ মান্য করা হবে না; ডুমার কাজ যেমন চলেছে,

তেমনই চলতে থাকবে। সভাপতি রডজিয়াঙ্কো ডুমার এই সিদ্ধান্তের কথা তারযোগে জারকে জানিয়ে দিলেন।

ডুমার সভাপতির কাছ থেকে এই তারবার্তা পেয়ে জার একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তিনি বুঝতেই পারলেন না, কাদের জোরে ডুমা তাঁর আদেশ অমান্য করতে সাহসী হলো! তিনি তাই ডুমার সদস্যদের কিভাবে জব্দ করা যায় সেই কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

জার যখন এই কথা চিন্তা করছেন সেই সময় ডুমার সভাপতির দ্বিতীয় তারবার্তা তাঁর হস্তগত হলো। সেই তারবার্তায় সভাপতি তাঁকে জানালেন :

> "পেট্রোগ্রাদের অবস্থা জটিল হয়ে উঠেছে। সর্বত্র অরাজকতা চলছে। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। খাদ্য ও জ্বালানী সরবরাহের অবস্থা বিশৃঙ্খলার চরম সীমায় পৌঁছেছে। রাস্তায় রাস্তায় যথেচ্ছভাবে গুলিবর্ষণ চলছে। এই অবস্থার প্রতিকার করতে হলে অবিলম্বে জনসাধারণের মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করা দরকার।"

এই তারবার্তা পাঠানো হয়েছিল ১২ই মার্চ বিকেলে। কিন্তু জার এর কোনো উত্তরই দিলেন না। সারা রাত অপেক্ষা করে পরদিন সকালে রডজিয়াঙ্কো আবার জারকে তারবার্তা পাঠালেন। এই তারবার্তায় জানানো হলো :

> "অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। শেষ মুহূর্ত সমুপস্থিত। রাজবংশের ভাগ্য নির্ণীত হতে চলেছে। আগামী কালের জন্যে অপেক্ষা করলে অবস্থা প্রতিকারের বাইরে চলে যাবে।"

গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল আলেকজান্দ্রাভিচও জারের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে অবিলম্বে কিছু করতে বললেন। জার কিন্তু উল্টো বুঝলেন। তিনি গ্র্যাণ্ড ডিউককে জরুযোগে আদেশ দিলেন, "পেট্রোগ্রাদে দলে দলে সৈনিক এনে বিদ্রোহ দমন করন।"

ডুমার সভাপতির তারবার্তার কোনো উত্তরই তিনি দিলেন না। কেউ কেউ সন্দেহ করেন যে, জার হয়তো জারিনার সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলেই ডুমার সভাপতির তারবার্তাকে আমল দেননি।

আগেই বলেছি যে, জারিনা তখন বিরামকুঞ্জে অবস্থান করছিলেন। পেট্রোগ্রাদ থেকে দূরে থাকার জন্যে ওখানকার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণাই ছিলো না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর দেরী হলো না। নানা সূত্র থেকে খবর পেয়ে তিনি শেষ পর্যন্ত অবস্থার গুরুত্ব বুঝতে পারলেন। কিন্তু তখন আর কিছু করণীয় নেই। অবস্থা তখন আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। জারিনার কিন্তু মনে হলো যে, এখনও সময় আছে। তিনি তাই জারকে এক তারবার্তায় জানালেন :

> "রাজধানীর অবস্থা ভাল নয়। জনসাধারণকে এখনই কিছুটা অধিকার দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।"

জারিনার কাছ থেকে এই তারবার্তা পেয়েই জার তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে মহিলেভ থেকে রওনা হলেন। কিন্তু ওখ্ স্টেশনে এসেই জারের স্পেশাল ট্রেন আর এগোতে পারলো না। বিপ্লবী সৈনিকরা জারের ট্রেন আটকে দিলেন। এটা হলো ১৩ই মার্চের ঘটনা।

ট্রেনের কামরার চব্বিশঘণ্টা আটক থাকার পর ১৪ই মার্চ গভীর রাত্রে স্টেশনের কর্মচারিদের সাহায্যে জার বড়জিয়াঙ্কোর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলবার ব্যবস্থা করলেন।

জার তাঁকে জানালেন যে, এখন তিনি জনসাধারণকে কিছুটা অধিকার দেবার কথা বিবেচনা করতে রাজী আছেন। এর উত্তরে বড়জিয়াঙ্কো জানালেন :

> "জনসাধারণকে অনুগ্রহ দেখাবার প্রশ্ন এখন আর আসে না। এবার আপনি সিংহাসন ত্যাগ করবার জন্যে প্রস্তুত হোন।"

বড়জিয়াঙ্কোর কথায় জারের বুদ্ধির গোড়ায় জল গেল। তিনি বুঝতে

পারলেন যে, তার ভ্রান্ত নীতি এবং জারিনার কু-পরামর্শেই আজ তাঁকে গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করেছে। তিনি তখন ক্ষুণ্ণ মনে আবার তাঁর কামরায় ফিরে গেলেন।

পরের দিনও জারকে ট্রেনের কামরায় আটক থাকতে হলো। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস! তিন দিন আগেও যার কথাই ছিল আইন, আজ সেই প্রবল প্রতাপান্বিত জার অসহায় অবস্থায় ট্রেনের কামরার মধ্যে কার্যতঃ বন্দী। ওখান থেকে বেরিয়ে যাবার স্বাধীনতাও তাঁর নেই। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ট্রেনের কামরায় বসে তিনি নিজের ভাগ্যের কথাই চিন্তা করছেন। অবশেষে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো।

রাত প্রায় এগারটার সময় ডুমার দুজন সদস্য—গুচ্‌কভ্‌ এবং স্থলজিন এলেন জারের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁরা এসেই জারকে বললেন—"গণ বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আপনাকে এখনই সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে।"

তাঁদের মুখে এই কথা শুনে জার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। পরে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—"আমি প্রতারিত হয়েছি।"

এই কথা বলে জার কাগজ আর পেনসিল নিয়ে সিংহাসন ত্যাগ-পত্র লিখে তাতে সই দিয়ে গুচকভের হাতে দিয়ে বললেন—"আমাকে কি এই ট্রেনের কামরাতেই থাকতে হবে?"

গুছকভ বললেন—"না। আপনি এখন মহিলেভে থাকবেন। আপনকে ওখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।"

এই কথা বলেই গুচকভ্‌ আর তাঁর সঙ্গী ট্রেনের কামরা থেকে বেরিয়ে গেলেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ রাত ১১টা থেকে ১২ টার মধ্যে এই ঐতিহাসিক দলিল স্বাক্ষরিত হলো।

রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার ঃ

জারের সিংহাসন ত্যাগের আগেই ডুমার সদস্যদের ভেতরে সিংহাসনের

উত্তরাধিকার নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মিলিউকভ এবং আরও কয়েকজন সদস্য অভিমত প্রকাশ করেন, গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল আলেকজান্দ্রাভিচকে পরবর্তী জার করা হোক। কিন্তু বলশেভিক সদস্যরা এতে তীব্র আপত্তি জানান। তাঁদের অভিমত হলো, রাজবংশের কোনো ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসতে দেওয়া হবে না। গ্র্যাণ্ড ডিউক যেহেতু রাজবংশের লোক, সেইহেতু তাঁকে কিছুতেই জার করা চলবে না।

ডুমায় যখন এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা চলছে সেই সময় গুচকভ আর স্থূলজিন এসে হাজির হলেন। তাঁরা জারের সিংহাসন ত্যাগ-পত্রখানা সভাপতির হাতে দিয়ে বললেন—"এবার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হবেন, তা আমাদের স্থির করতে হবে।"

তাঁদের কথার উত্তরে কেরেনস্কি বললেন—"রাশিয়ায় রাজসিংহাসন ব'লে কিছু থাকবে না। এখানে এখন প্রবর্তিত হবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা।"

কেরেনস্কির কথার প্রতিবাদ করে গুচকভ্, স্থূলজিন এবং আরও কয়েকজন সদস্য গ্র্যাণ্ড-ডিউকের পক্ষে ওকালতি শুরু করলেন। কিন্তু বলশেভিক সদস্যরা এমন তীব্রভাবে আপত্তি জানালেন যে, সভাপতি তখনই গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তিনি যেন ডুমার সিদ্ধান্ত না জেনে সিংহাসনে বসতে চেষ্টা না করেন।

পরদিন সকালে ডুমার সভাপতি রডজিয়াঙ্কো এবং তিনজন সদস্য—কেরেনেস্কি, প্রিন্স ভফ্ এবং মিলিউকভ গ্র্যাণ্ড ডিউকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, ডুমার অধিকাংশ সদস্যের অভিমত হলো, রাজবংশের কোনো ব্যক্তি সিংহাসনে বসতে পারবেন না।

ডুমার এই অভিমত জানবার পর গ্র্যাণ্ড ডিউক বললেন—"বেশ, তাই হবে। আমি রাজসিংহাসনের দাবি পরিত্যাগ করছি।"

এরপর তিন দিন পার হয়ে গেলেও রাশিয়ায় কোনো সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো না। ইতিমধ্যে জার তাঁর ছেলের জন্যে সিংহাসনের দাবি তুলতে চেষ্টা

করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হলো না। ব্যাপার দেখে জারও এ বিষয়ে আর বেশী দূর এগোতে সাহস করলেন না।

অবশেষে জারের সিংহাসন ত্যাগের চার দিন পরে কোনো রকমে একটা অস্থায়ী সরকার গঠিত হলো। এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রিন্স ভফ্। বিপ্লবী সদস্যদের মধ্যে একমাত্র কেরেনস্কিই সেই মন্ত্রীসভায় স্থান পেলেন।

এই মন্ত্রীসভার আদেশে ভূতপূর্ব জারকে জারস্কুসেনোয় এনে নজরবন্দী ক'রে রাখা হলো। ভূতপূর্ব জারিনা এবং তাঁর ছেলেমেয়েদেরও ওখানেই রাখা হলো। একদিন যে রাজকীয় ভবন জার এবং জারিনার বিরামকুঞ্জ ছিলো, সেটি এবার পরিণত হলো বন্দীশালায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মার্চ-বিপ্লবের পরবর্তী অবস্থা

মার্চ-বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলেও রাশিয়ার জনসাধারণের বিশেষ কোনো সুরাহা হলো না। যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হলো, সে সরকার সমাজতন্ত্রের ধারে-কাছেও গেল না। অস্থায়ী সরকারের চেহারা দেখলেই এটা বুঝতে পারা যায়। যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল তাতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন প্রিন্স ভফ্। ইনি ছিলেন বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন গণতান্ত্রিক দলের নেতা। এই দলটি গঠিত হয়েছিল উদারপন্থীদের নিয়ে। এরা ইংল্যাণ্ডের সরকারের মতো নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী ছিলো। এই দলের আর একজন নেতা ছিলেন মিলিউকভ্। অস্থায়ী সরকারে ইনি পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ লাভ করেন। অর্থমন্ত্রী হন একজন বড় ব্যবসায়ী। বাণিজ্য-মন্ত্রী হন এক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং সামরিক বিভাগের মন্ত্রী হন একজন প্রতিষ্ঠাবান

ব্যাঙ্কার। সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে শুধু আলেকজান্দার কেরেনস্কি এই সরকারে স্থান লাভ করেন। ইনি হন বিচার-বিভাগের মন্ত্রী।

মন্ত্রীসভার এই চেহারা দেখেই ডুমার তৎকালীন চেহারা বেশ বুঝতে পারা যায়।

ডুমার তৎকালীন চেহারা ঃ

মার্চ-বিপ্লবের সময় রাশিয়ায় যে ডুমা প্রতিষ্ঠিত ছিলো তাতে বলশেভিক দলের প্রাধান্য ছিল না। ওপরে যে গণতান্ত্রিক দলের কথা বলা হয়েছে সেই দলটি ছাড়া 'অক্টোবর পন্থী' নামে আরও একটি দল ছিলো। এই দলটি গঠিত হয়েছিল জমিদার ও ধনিক-শ্রেণীর প্রতিনিধিদের নিয়ে। ডুমার সভাপতি রডজিয়াঙ্কো ছিলেন এই দলের কর্ণধার এবং এর অন্যতম নেতা ছিলেন গুচকভ্। ডুমার যে সব সমাজতন্ত্রী সদস্য ছিলেন তাঁরা আবার দুই দলে বিভক্ত হওয়ায় (অর্থাৎ মেনসেভিক ও বলশেভিক) ডুমার মধ্যে তাঁদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিলো না। এই যেখানে অবস্থা সেখানে অস্থায়ী সরকার যে, ডুমার প্রতিরূপ হবে তাতে আর সন্দেহ কি!

মন্ত্রীসভার ক্রিয়া-কলাপ ঃ

মন্ত্রীসভা তার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম নিয়ে এত ব্যস্ত রইলো যে, মার্চ-বিপ্লবের প্রকৃত তাৎপর্য তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো না। দেশের শিল্প-সমস্যা সম্বন্ধে মন্ত্রীসভা উদাসীন হয়ে রইলো। জমির ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে কৃষকদের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিলো সে সম্বন্ধেও মন্ত্রীসভা কোনো রকম উচ্চবাচ্য করলো না। তবে লোক দেখানো একটা ঘোষণা করা হলো যে, গণপরিষদের অধিবেশনের আগে এ বিষয়ে কোনো কিছু করা সম্ভব হবে না।

মন্ত্রীসভা জার সরকারের যুদ্ধ-নীতিরও কোনো পরিবর্তন করলো না। এর ওপর পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলিউকভ্ হঠাৎ এক ঘোষণা করে জনসাধারণকে জানিয়ে দিলেন যে, রাশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্যে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করা তার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

বিপ্লবের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো যুদ্ধের অবসান ঘটানো। কিন্তু মন্ত্রীসভা সে বিষয়ে কিছু না করায় জনসাধারণের মধ্যে আবার বিক্ষোভ দেখা দিলো। জনসাধারণ ক্ষুদ্ধ চিত্তে ভাবতে লাগলো, এই উদ্দেশ্যেই কি বিপ্লবের জন্যে তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতে এগিয়ে এসেছিলেন! এই উদ্দেশ্যেই কি শ্রমিক আর সৈনিকরা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলো?

জনসাধারণের মনে এই প্রশ্ন দেখা দেবার ফলে দিকে দিকে আন্দোলন শুরু হলো। পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ঘোষণা নিয়ে জনসাধারণ প্রকাশ্যেই সমালোচনা করতে লাগলো। ব্যাপার দেখে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর ওই উক্তি সরকারের অভিমত নয়। কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর এই ঘোষণাও জনগণকে শান্ত করতে পারলো না।

বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা ঃ

মার্চ-বিপ্লবের পরে রাশিয়ার সর্বত্র বহুসংখ্যক সোভিয়েট গঠিত হয়েছিলো। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিবর্গ, দোকানদার সমিতি, কৃষক, শিল্পী, চাকুরে এবং সৈনিকদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছিলো ওই সব সোভিয়েট। ওই সব সোভিয়েটে প্রথম দিকে মেনশেভিকদেরই প্রাধান্য ছিলো। এই দল ১৬ই এপ্রিল সোভিয়েটগুলির এক কংগ্রেস আহ্বান করলো। বলাবাহুল্য, কংগ্রেসেও মেনশেভিদেরই প্রাধান্য ছিল। এই কংগ্রেস হতে জনসাধারণের কাছে এক আবেদন প্রচার করা হলো। তাতে বলা হলো, কংগ্রেসই বিপ্লবী শক্তির একমাত্র ধারক ও বাহক; সুতরাং একমাত্র কংগ্রেসই বিপ্লবের শত্রুদের ধ্বংস করতে সমর্থ। আবেদনপত্রে আরও বলা হলো, যেহেতু অস্থায়ী সরকার বিপ্লবকে সুসংবদ্ধ করতে চেষ্টা করছে, সেইহেতু এই সরকারকে সমর্থন করা দেশবাসীর অবশ্য কর্তব্য। আবেদন পত্রে অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধনীতির পক্ষেও ওকালতি করা হয়।

এই আবেদন পত্রের বয়ান পড়ে জনসাধারণ আদৌ খুশি হতে পারে না। ফলে অস্থায়ী-সরকারের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে হ্রাস পায় এবং চরম পন্থী বলশেভিকদের শক্তি বেড়ে যায়।

রাশিয়ার রাজনীতিক্ষেত্রে যখন এই রকম অবস্থা চলছে ঠিক সেই সময়ই লেনিন রাশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে অবতীর্ণ হন।

প্রাক-বিপ্লব কালের নেতৃত্ব ঃ

প্রাক-বিপ্লবকালে লিয়ঁ ট্রটস্কিই ছিলেন বিপ্লবী জনগণের অবিসংবাদী নেতা। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি এবং সংগঠন-প্রতিভা শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্রসমাজকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের বিপ্লবের পথে টেনে এনেছিলো। কিন্তু রাজরোষে পতিত হবার ফলে তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাশিয়ায় উপস্থিত থেকে বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিতে পারেননি। তিনি যখন বিপ্লববাদ প্রচারে ব্রতী হন সেই সময়ই জার সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই সময় তিনি কিভাবে সরকারী রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন করেন এবং বহু দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ভিয়েনাতে উপস্থিত হন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু বিপ্লবী রাশিয়ার নেতৃত্ব হতে তিনি কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন এবং তাঁর পরিবর্তে বিপ্লবী জনগণের নেতৃত্ব লেনিনের হাতে এসে যায়, সে কথা বুঝতে হলে ট্রটস্কির রাজনৈতিক জীবনের পরবর্তী অধ্যায় সম্বন্ধে জানা দরকার। আমরা তাই লেনিন সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করবার আগে ট্রটস্কি সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত, তিনি ভিয়েনাতে ছিলেন এবং সেখান থেকে বিপ্লবমূলক পুস্তিকাদি লিখে গোপন পথে রাশিয়ায় পাঠাচ্ছিলেন। ওখানে থাকাকালে তিনি ইয়োরোপের বিভিন্ন গণসংস্থার সংস্পর্শে আসেন। আন্তর্জাতিক মতবাদও তাঁর মনে এই সময় প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে তিনি গণ বিপ্লবের যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার বীজ এই সময়ই তাঁর মানসক্ষেত্রে উপ্ত হয়।

যুদ্ধ শুরু হবার অব্যবহিত পরে অষ্ট্রিয় সরকার ট্রটস্কিকে ভিয়েনা পরিত্যাগ করবার নির্দেশ দেয়। তাঁর যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব এবং প্রচার কার্যের ফলেই অষ্ট্রিয় সরকার তাঁর উপরে এই আদেশ জারী করেছিলো। এই আদেশের

ফলে ট্রটস্কি ভিয়েনা পরিত্যাগ করে সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানেও তিনি বেশিদিন থাকতে পারেন না। ওখান থেকে তিনি প্যারীতে যান এবং সেখানে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তার ফলে ফ্রান্স হতেও তিনি বিতাড়িত হন।

ফ্রান্স থেকে বিতারিত হবার পর তিনি স্পেনে গিয়ে আশ্রয় নেন। ওখানে তিনি শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার শুরু করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই শ্রমিকদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত ওখানেও তিনি থাকতে পারেন না। নানা প্রতিকূল অবস্থা দেখা দেওয়ার শেষ পর্যন্ত তিনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে আশ্রয় নেন।

রাশিয়ার গণ-বিপ্লব শুরু হবার আগে পর্যন্ত তিনি একজন প্রগতিশীল লেখক রূপে যুক্তরাষ্ট্রে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। রাশিয়ায় গণ-বিপ্লব শুরু হবার সংবাদ পেয়ে ট্রটস্কি আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলেন—"এ বিপ্লব শুধু রাশিয়ার বিপ্লব নয়, এটা হলো ইয়োরোপের গণ-বিপ্লবের প্রথম অবস্থা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, রাশিয়ার এই গণ-বিপ্লব কিছুদিনের মধ্যেই ইয়োরোপ এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়বে এবং অশান্তিময় পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে।"

তিনি তখন আর কালবিপ্লব না করে রাশিয়া অভিমুখে রওনা হন।

আমেরিকা থেকে রাশিয়া যেতে হলে ইংল্যাণ্ড হয়ে যেতে হয়। কিন্তু ট্রটস্কি ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার তাঁকে হালিফ্যাক্স-এ আটক করে রাখে। এদিকে রাশিয়ায় তখন বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিও হয়ে এক অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই অস্থায়ী সরকার তখন ইংরেজ সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ট্রটস্কিকে অবিলম্বে মুক্তি দেবার দাবী জানায়। সেই দাবী অনুসারে ইংরেজ সরকার ট্রটস্কিকে মুক্তি দেয়। মুক্তি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রটস্কি রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন।

রাশিয়া থেকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকার ফলেই ট্রটস্কির নেতৃত্বে কিছুটা ভাটা পড়ে। এদিকে লেনিন তাঁর অসীম ব্যক্তিত্ব এবং ক্ষুরধার যুক্তি নিয়ে যখন

বিপ্লবীদের সামনে উপস্থিত হন তখন তাঁরা মনে-প্রাণে লেনিনের নেতৃত্ব মেনে নেন। মার্চ বিপ্লবের পরে এবং নভেম্বর বিপ্লবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লেনিনই ছিলেন বিপ্লবী রাশিয়ার সর্বপ্রধান নেতা। এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন যোশেফ স্তালিন আমরা তাই নভেম্বর-বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে লেনিন ও স্তালিন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

রাশিয়ার গণবিপ্লবে লেনিনের অবদান

রাশিয়ার গণ-বিপ্লবে, বিশেষ করে নভেম্বর-বিপ্লবে লেনিনের অবদান অপরিসীম। তিনি ছিলেন বলশেভিক দলের সর্বপ্রধান নেতা। বলশেভিক দল কখন এবং কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সে কথা আমরা আগেই বলেছি। এই দলটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই লেনিন এর নেতৃত্ব করতে থাকেন। তবে প্রথমদিকে এই দল সোস্যাল ডেমোক্র্যাট দলের অন্যতম শাখা হিসেবে কাজ করতে থাকায় অন্য-নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে যখন বলশেভিক দল সম্পূর্ণ আলাদা রাজনৈতিক দল হিসাবে গঠিত হয়, তখন থেকেই দলের বিপ্লবী কর্মধারা প্রকটিত হতে থাকে। কিন্তু এখানে বলশেভিক দল সম্বন্ধে অমরা আলোচনা করছি নে। এখানে আমরা লেনিন সম্বন্ধেই বিশেষভাবে আলোচনা করছি। লেনিন সম্বন্ধে আগেও কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোচনার সময় আমরা বলেছিলাম তাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী পরে আলোচনা করা হবে। এখানে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে তবে লেনিনের জীবনের বিরাট কর্মকাণ্ডের কথা এখানে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা তাই যথাসম্ভব সংক্ষেপে গণবিপ্লবে তাঁর অবদানের কথা এখানে বিবৃত করছি।

কিন্তু গণ-বিপ্লবে তাঁর অবদানের কথা আলোচনা শুরু করবার আগে তাঁর ব্যক্তিগত-জীবন সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। প্রথমেই বলছি তাঁর বিবাহের কথা। লেনিন যখন সইবেরিয়ার শুশেনস্কয়েতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন সেই সময় শ্রমিক মুক্তি সঙ্ঘের মহিলা সভ্য নাদেজদা কনস্তান্তিনোভনা ক্রুপস্কায়াও নির্বাসিত হন। প্রথমে তাঁকে উফা গুর্বেনিয়ায় পাঠানো হয়। কিন্তু পরে লেনিনের বাগদত্তা বধূ হিসাবে তাঁর কাছে থাকবার অনুমতি পান। ওখানেই তাঁদের বিয়ে হয়। তখন থেকে ক্রুপস্কায়া হন একাধারে লেনিনের স্ত্রী ও বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গিনী।

'লেনিন' নামের ইতিহাস ঃ

রাশিয়ার অন্যতম বিপ্লবী নেতা প্লেখানভ 'ভলগিন' ছদ্মনামে 'ইস্ক্রা' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতেন। রাশিয়ার নদী 'ভলগার' নামানুসারে এই ছদ্মনামটা তিনি নিয়েছিলেন। ভ্লাদিমির উলিয়ানভও তখন 'লেলিন' ছদ্মনাম গ্রহন করেন। মনে হয় এ নামটা তিনি নিয়েছিলেন রাশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত নদী 'লেনা' র নামানুসারে।

লেনিনের ব্যক্তিগত কথা এখানেই শেষ করে এবার আমরা গণ-বিপ্লবে তাঁর অবদানের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

রাশিয়ায় তখন বিপ্লবের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় বিদেশে বাস করা লেনিনের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠে। তিনি তখন স্বদেশে ফিরে আসবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গে চলে আসেন। স্বদেশে এসেই তিনি বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সেণ্টপিটার্সবুর্গ কমিটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি পার্টির কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে সময় মতো স্নানাহারও করতে পারতেন না। এর ওপরে আর এক নতুন দায়িত্ব এসে তাঁর কাঁধে চেপেছিলো। এটা হলো বলশেভিক পার্টির প্রকাশ্য পত্রিকা 'নভামা জীজন' পরিচলনা। এই পত্রিকাতেই লেনিনের বিখ্যাত রচনা 'পার্টি সংগঠন এবং পার্টি-সাহিত্য' প্রকাশিত হয়।

কিন্তু এ সবই তাকে করতে হতো 'আণ্ডার গ্রাউণ্ড'-এ থেকে। পুলিসের চোখে ধুলো দেবার জন্যে এই সময় প্রায়ই তাঁকে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতো। কয়েকবার ফিনল্যাণ্ডেও যেতে হয়েছিলো তাঁকে।

এই সময়েই (ডিসেম্বর মাসে) মস্কোতে শ্রমিকদের এক সশস্ত্র অভুত্থান হয়। নয় দিন শ্রমিকরা অসীম বীরত্বে জারের পুলিশ আর সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করে। বিখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কি তখন মস্কোয় অবস্থান করছিলেন। লড়াইতে শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ আত্মোৎসর্গ দেখে তিনি ১০ই ডিসেম্বর লেনিনকে একখানা চিঠি লেখেন। চিঠিতে তিনি লেখেন ঃ

"এই মাত্র রাস্তা থেকে এলাম। নিকলায়েভ স্টেশনের কাছে, সান্দুনভ স্নানাগারের কাছে, স্মলেনস্ক বাজারের কাছে এবং কুদ্রিনোতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। চমৎকার যুদ্ধ! গতকাল বেলা দুটো থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে। সারারাত ধরে চলেছে, আজও চলছে—অবিরাম, অবিশ্রাম। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ ও সৈনিকদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অভাবনীয় লড়াই চালাচ্ছে শ্রমিকরা।"

শ্রমিকদের অভ্যুত্থানকে শেষ পর্যন্ত দখল করতে সক্ষম হয় জার সরকার। বহু শ্রমিক হতাহত হয় লড়াইতে।

এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর লেনিন এর ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন—"হাতিহার তুলে ধরা উচিত ছিলো দৃঢ় সংকল্পে, প্রয়োজন ছিলো আক্রমণাত্মক লড়াই চালাবার। সৈনিক এবং কৃষকদের দলে টানা উচিত ছিলো।" ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের এই হলো শিক্ষা। এই শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তী সংগ্রামের জন্যে শ্রমিকদের প্রস্তুত হতে আহ্বান জানালেন লেনিন।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ষ্টকহোমে সোস্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এই কংগ্রেসে লেনিন কৃষি সমস্যা এবং শ্রমিক শ্রেণীর আশু কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। এছাড়া ডুমার প্রতি মনোভাবের প্রশ্নে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও সংগঠনিক প্রশ্নেও তিনি বক্তব্য রাখেন।

ওই বছরই ৯ই মে তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গের তিন হাজার লোকের জনসভায়

এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে বুর্জোয়া কাদেত্ পার্টির সমঝোতার কথা ফাঁস করে দেন এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবী লাইন সমর্থন করেন।

এপ্রিল মাসের শেষ দিকে লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক শ্রমিক পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। লেনিন ওই কংগ্রেসে বলশেভিকদের নেতৃত্ব করেন। এই কংগ্রেসে ম্যাক্সিম গোর্কিও যোগদান করেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লেনিনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

জুন মাসের শুরুতে লেনিন আবার ফিনল্যাণ্ডে গিয়ে আত্মগোপন করেন। জার সরকার ফিনল্যাণ্ডের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন লেনিনকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দেবার জন্যে। খবরটা জানতে পেরে লেনিন ওদেশের পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন করেন এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর পর্যন্ত নানাস্থানে আত্মগোপন করে থাকেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে লেনিন আবার চলে যান জেনেভায়। ওখানে তিনি 'প্রলেতারি' পত্রিকাটি পুনঃ প্রকাশ করেন। (পত্রিকাটি জারের রোষদৃষ্টিতে পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।) পরবর্তীকালে (অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে) পত্রিকাটি প্যারীতে স্থানান্তরিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সস্ত্রীক লেনিন প্যারীতে চলে যান। তাঁরা তখন বাস করতেন প্যারীর মারি রোজ স্ট্রীটের ৪নং বাড়ির একটি ফ্লাটে। লেনিনের প্যারীতে আগমনের কিছু পরেই এখানে বলশেভিক পার্টির এক সম্মেলন বসে। সেই সম্মেলনে লেনিন আপোসহীন সংগ্রামের ডাক দেন।*

যুদ্ধ বিরোধী সম্মেলন ঃ

মহাযুদ্ধ শুরু হবার কয়েক মাস পরেই (১৯১৫) সমাজতন্ত্রী নেতারা সিমার-ওয়াল্ডে (Zimmerwald) এক যুদ্ধ-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। এই

---

* লেলিনের জীবনের পরবর্তী ঘটনাবলী যাঁরা জানতে চান তাঁরা লেনিনের জীবনিগ্রন্থ পড়তে পারেন।

সম্মেলনে লেনিন এবং রাশিয়ার আরও অনেক নির্বাসিত বিপ্লবী নেতা যোগদান করেন। 'উক্ত সম্মেলনে লেনিন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, সমাজতন্ত্রীরা যুদ্ধরত প্রত্যেক দেশে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাবেন এবং সর্ববিধ উপায়ে যুদ্ধের প্রসার ব্যহত করতে চেষ্টা করবেন। এছাড়া প্রত্যেক দেশেই যাতে গণ-বিপ্লব সংঘটিত হয় তার জন্যে প্রস্তুতি চালাতে হবে এবং প্রথম সুযোগেই গণ-বিপ্লব শুরু করতে হবে। এই প্রস্তাবে তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেক দেশের শ্রমিকরা যদি গণ-বিপ্লব সার্থক করে তুলতে সচেষ্ট হয় তাহলে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত করা অসম্ভব হবে না।

পরের বছর (১৯১৬) এই রকম আর একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কিয়েনথল-এ (Kienthal)। এই সম্মেলনে লেনিন আগের বছরের মতোই বিশ্ব-বিপ্লবের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাঁর প্রস্তাব যথারীতি গৃহীত হয় কিন্তু কার্যকালে কিছুই হয় না। যে সব সমাজতন্ত্রী নেতা পূর্বোক্ত যুদ্ধ-বিরোধী সম্মেলনে ভীষণ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা জাতীয়তাবাদের নিকট আত্মসমর্থন করেন।

সমাজতন্ত্রী নেতাদের এই রকম কাজ-কর্ম দেখে লেনিন একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু নিরাশ হয়ে কাজ বন্ধ করবার লোক তিনি ছিলেন না, আবার তিনি তাঁর বিপ্লবী কাজ-কর্ম শুরু করে দিলেন। বিশ্ব-বিপ্লব নিয়ে আর তিনি মাথা ঘামালেন না। এই যুদ্ধের সুযোগে রাশিয়ায় কিভাবে গণ-বিপ্লব শুরু করা যায় সেই কথাই তিনি চিন্তা করতে লাগলেন।

ফিনল্যাণ্ড ও অষ্ট্রীয়ার বিপ্লবীদের কর্মকেন্দ্র স্থাপিত ঃ

যুদ্ধ শুরু হবার সাথে সাথেই ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার অধীনতা-পাশ ছিন্ন করবার কথা চিন্তা করছিলো। ফিনিশ নেতাদের এই মনোভাবের কথা জানতে পেরে বিপ্লবী নেতারা সেখানে গিয়ে তাঁদের গোপন ক্রিয়া-কলাপ চালাতে থাকেন। ফিনল্যাণ্ডের নেতারাও পরোক্ষে তাঁদের সাহায্য করতে থাকেন।

অষ্ট্রিয়ার ক্রাকাউ শহরেও রুশ-বিপ্লবীরা একটি গোপন বিপ্লব-কেন্দ্র স্থাপন

করেন। মহাযুদ্ধে রাশিয়া, জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার প্রতিপক্ষ হিসেবে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ জোটে যোগদান করেছিলো বলেই জার্মান এবং অষ্ট্রিয় সরকার রুশ-বিপ্লবীদের প্রশ্রয় দেয়।

জার্মান এবং অষ্ট্রিয়ান সরকার মনে করতো যে, রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হলে তাদের পক্ষে বিশেষ স্থবিধে হবে। রুশ-বাহিনীর অগ্রগতি রুখবার জন্যে জার্মানী তার পূর্ব সীমাতে এক বিরাট সেনা-বাহিনী মোতায়েন করে রেখেছিলো। জার্মান সমর-নায়করা মনে করতেন যে, রাশিয়ায় বিপ্লব শুরু হলে জার সরকার তাঁর সেনাবাহিনীকে দেশে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবেন। এবং এর ফলে পূর্ব সীমান্তের বিরাট জার্মান বাহিনীকে পশ্চিম সীমান্তে নিয়োজিত করা যাবে।

কিন্তু জার্মান সরকারের এই সিদ্ধান্ত কোনো কোনো সেনানায়ক মনে-প্রাণে সমর্থন করতে পারেননি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় জেনারেল লুডেনডর্ফ-এর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ My War Memories-এ। তাতে লেখা আছে :

By sending Lenin our Goverment had assumed a great responsibility. From the military point of view his journey was justified, for Russia had to be laid. But our Government should have seen it that we also were not involved in her fall.

লেনিনের রাশিয়ায় আগমন :

মার্চ-বিপ্লবের পরে জারের সিংহাসন ত্যাগের খবর জার্মানীতে পৌছামাত্রই কাইজার এক ইস্তাহার মারফৎ ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার রাশিয়ার সমস্ত বিপ্লবীদের দেশে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে। কাইজারের এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হবার পর সুইজারল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রী নেতা ফ্রিটার প্লাটেন জার্মান কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ত্রিশ জন রুশ-বিপ্লবীকে রাশিয়ায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এঁদের মধ্যে লেনিনও ছিলেন। জার্মান কর্তৃপক্ষ একখানা গাড়িতে বিপ্লবীদের তুলে দিয়ে গাড়িখানাকে অর্গল-বদ্ধ করে রুশ-সীমান্তে পৌছে দেন। জার্মানীর ভেতরে বিপ্লবীরা যাতে কারো সঙ্গে কোনো

রকম বাক্য বিনিময় করতে না পারেন সেই উদ্দেশ্যেই গাড়ীটাকে অর্গল-বদ্ধ করা হয়েছিল। সে সময় সেই অর্গলবদ্ধ গাড়ির (sealed car) রহস্য নিয়ে দেশ-বিদেশে যে সব জল্পনা-কল্পনা চলেছিলো, এটাই তার একমাত্র রহস্য।

গাড়িখানা ফিনল্যাণ্ডের সীমান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অর্গল খুলে দেওয়া হয়। লেনিন তখন দেখতে পান যে বহুসংখ্যক নরনারী তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য রেল স্টেশনে সমবেত হয়েছেন। তাদের লক্ষ্য করে লেনিন একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন।

সেই ভাষণে তিনি যা বলেন তার মর্মকথা হলো—সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধ ইয়োরোপে যে অন্তর্বিপ্লবের সূচনা করেছে তার ফলে ইয়োরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসে পড়তে পারে। সমাজ-বিপ্লবের রক্তরাঙা উষাগমের আর দেরী নেই। সুতরাং আগামী দিনের সেই বিপ্লবের জন্যে এখন থেকেই জনগণকে প্রস্তুত হতে হবে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল লেনিন পেট্রোগ্রাদে পৌছালেন। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সেদিন বহুসংখ্যক নরনারী সমবেত হয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ ছাড়া বলশেভিক দলের প্রায় দু'শ সদস্য তাঁকে স্বাগত জানাতে এসে-ছিলেন। তাঁদের সামনে তিনি সেদিন এক জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। ভাষণের শেষে তিনি বলেন—"আমরা অবিলম্বে শান্তি চাই, জমির মালিকানা কৃষকদের দিতে চাই আর কারখানার মালিকানা শ্রমিকদের দিতে চাই। সমস্ত ক্ষমতা থাকবে সোভিয়েতের হাতে। তিনি আরও বলেন, এখনই বলশেভিকদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে হবে এবং সোভিয়েতগুতিতে প্রাধান্য অর্জন করতে হবে।"

লেনিনের এই চরম মতবাদ তাঁর দলের লোকেরাও সেদিন সমর্থন করতে পারেননি। এমনকি ট্রটস্কিও তাঁকে পুরোপুরি সমর্থন করতে পারলেন না।* কিন্তু সহকর্মীদের সমর্থন না পেলেও লেনিন দমলেন না। তিনি স্বমতে অটল হয়ে রইলেন।

এরপর কি ঘটেছিল সে কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিবৃত করা হচ্ছে।

---

* ট্রটস্কি লেনিনের আগেই রাশিয়ায় ফিরে এসেছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

নভেম্বর বিপ্লব এবং নয়া রাশিয়ার গোড়পত্তন

লেনিন রাশিয়ার বুকে পদার্পণ করেই ঘোষণা করেন, বলশেভিক দলকে অবিলম্বে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করতে হবে এবং সোভিয়েটগুলিতে বলশেভিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ঘোষণা তিনি করেছিলেন, ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। তাঁর এই ঘোষণাকে রূপদান করার উদ্দেশ্যে পরবর্তী মাসে বলশেভিকদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বলশেভিক দলের প্রত্যেক কর্মী এবং নেতা উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে লেনিন তাঁর মতবাদ আর একবার ঘোষণা করলেন। তাঁর সেই মতবাদ শুনে দলের সদস্যরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। লেনিনের মুখ থেকে সেদিন বের হলো শুধু ধ্বংসের বাণী।

দলীয়-নেতারা তাঁর এই চরম মতামতকে সমর্থন করতে পারলেন না। জিনোভিভ্, রাইকভ্, কেমেনফ্, নগিন প্রমুখ নেতারাও তাঁর বিরোধীতা করলেন। এমনকি ট্রটস্কিও তাঁকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করতে পারলেন না। তাঁদের বিরোধীতার মুখেও লেনিন অটল পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে জোড়ালো ভাষায় যুক্তির পর যুক্তি উত্থাপন করে যেতে লাগলেন। তাঁর সেইসব যুক্তির স্রোতে বিরোধীদের বক্তব্য ভেসে গেল। বলশেভিক দল তাঁর মতামত গ্রহণ করলো। লেনিন সেদিন তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার উপসংহারে বলেছিলেন—"Immediate Peace. The land to the peasants, the factorie to the workers. All powers to the Soviets.

এই সম্মেলনের পর থেকেই বলশেভিক দল রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করবার জন্যে সচেষ্ট হলো। কিভাবে তারা শাসনযন্ত্র দখল করলো সে কথা বলবার আগে শাসনযন্ত্রের অবস্থা তখন কি রকম ছিলো সে সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার।

শাসনযন্ত্রের তৎকালীন অবস্থা ঃ

রাশিয়ার তখন যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিলো এবং যে মন্ত্রীসভা সেই সরকার পরিচালনা করছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা আগেই কিছু আলোচনা করেছি। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে মন্ত্রীসভা একেবারে দিশেহারা এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ না করে সুবিধেবাদীর মতো কাজ করে চলেছিলেন।

এদিকে জনগণ তখন ক্রমাগত দাবি তুলছিলেন যে, জারের আমলের সমস্ত কর্মচারিকে অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে। নবলব্ধ স্বাধীনতার উন্মাদনায় জনগণ আরও অনেক রকম দাবি উপস্থিত করেছিলেন। এগুলির মধ্যে অসম্ভব এবং অবাস্তব দাবিও অনেক ছিলো। তখনকার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিলো যে, রাশিয়ার জনসাধারণ যেন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে।

এই রকম অরাজক অবস্থার মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে সোভিয়েট গঠিত হচ্ছিলো। এছাড়া 'জনরক্ষা সমিতি' নামে বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র সমিতিও গঠিত হচ্ছিলো। কর্তৃপক্ষকে কোনো রকম পরোয়া না করেই ওই সব প্রতিষ্ঠান গঠিত হচ্ছিলো।

প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ভফ্ দেশের এই অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে এমন এক ঘোষণাবাণী জারী করলেন, যার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে উঠলো। ঘোষণাবাণীতে তিনি বলেছিলেন, এখন হতে স্থানীয় জেম্‌স্টভো-র সভাপতিরাই সাময়িকভাবে গভর্ণরের কাজ করবেন। এর ফলে ক্ষমতা লাভের জন্যে চারদিকে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

রাশিয়ায় আভ্যন্তরীন অবস্থা যখন এই রকম সেই সময় বাইরের বিপদও কম ছিলো না। অস্থায়ী সরকারের নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধনীতি না থাকায় সৈনিকদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়বার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তারা তখন যুদ্ধের জন্যে মোটেই ব্যগ্র ছিলো না। জমিদারদের সম্পত্তি ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু হয়েছে কিনা সেই সংবাদের জন্যেই তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতো।

সৈনিকদের এই মনোভাব জার্মানরাও জানতে পেরেছিলো। তারা তাই লক্ষ লক্ষ ইস্তাহার ছেপে বিমানযোগে সেগুলো রুশ সৈনিকদের ভেতরে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো। তাতে লেখা ছিলো, "তোমাদের সরকার যখন যুদ্ধ-বিরোধী এবং শান্তিকামী তখন তোমরা যুদ্ধ করছো কেন ?"

জার্মানদের এই প্রচার রুশ-সৈনিকদের যুদ্ধের ইচ্ছাকে অনেকখানি শিথিল করে ফেলেছিলো। তারা তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলো— "সত্যিই তো! আমরা কার জন্যে যুদ্ধ করছি? এতে আমাদের স্বার্থ কি? না, আর আমরা যুদ্ধ করবো না। আমরা এবার ঘরে ফিরে যাবো।"

এর পরেই দলে দলে রুশ সৈনিক ঘরে ফিরতে লাগলো। ফলে পশ্চিম সীমান্ত নীরব হয়ে আসতে লাগলো। এই সুযোগে জার্মানরা তাদের সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে পূর্ব রণাঙ্গণে নিয়োজিত করলো। রুশ-সৈনিকদের এই রকম মনোভাব দেখে মিত্রপক্ষ শঙ্কিত হয়ে রাশিয়ার অস্থায়ী সরকারের কাছে তাদের রণনীতি ঘোষণা করবার দাবী জানালো। এর ফলে রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিলিউকভ রাশিয়ার যুদ্ধনীতি ঘোষণা করলেন। (এই যুদ্ধনীতি কি ছিলো সে কথা আগেই বলা হয়েছে, সুতরাং ও ব্যাপারে নতুন করে কিছু বলা হলো না।)

বলশেভিকদের প্রচার ঃ

মিলিউকভের সেই যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে বলশেভিকরা জোর প্রচার শুরু করে দিলেন। দলের নেতা হিসাবে লেনিন বললেন—অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধনীতি সাম্রাজ্যবাদের পরিপোষক। আমরা পররাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণের বিরোধী। প্রত্যেক দেশের শ্রমিকরাই আমাদের আপন জন, সুতরাং তাদের শোষণেরও আমরা ঘোরতর বিরোধী। শ্রমিক শ্রেণীর শোষিত হবার সম্ভাবনা আছে এমন কোনো কাজ আমরা করতে পারি নে।

লেনিনের এই উক্তির পর বিভিন্ন সোভিয়েটে অস্থায়ী সরকারের যুদ্ধনীতির লোচনায় মুখর হয়ে উঠলো। গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে যুদ্ধ বিরোধী

মিছিল বের হতে লাগলো। মিছিলে স্লোগান উঠলো—অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক ; মিলিউকর্ভ নিপাত যাক্।

জনগনের এই যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে সরকার সেনা-বাহিনী পাঠালো। সৈনিকরা বিভিন্ন জায়গায় মিছিলকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করলো। এর ফলে অস্থায়ী সরকারের ওপরে জনগনের যেটুকু আস্থা ছিলো তাও নষ্ট হয়ে গেল। ব্যাপার গুরুতর দেখে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন যে, পররাষ্ট্র মন্ত্রীর উক্তি সরকারের উক্তি নয়। কিন্তু এতে কোনোই কাজ হলো না। প্রধানমন্ত্রী তখন সখেদে বললেন—"আমার সরকারের প্রভুত্ব আছে কিন্তু ক্ষমতা নেই ঃ পক্ষান্তরে শ্রমিক-পরিষদের ক্ষমতা আছে কিন্তু প্রভুত্ব নেই।" (The Goverment is an authority without power, and the Workmen's Council is a power without authority.)

সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যে এই রকম বিরোধী ভাব দেখে যুদ্ধ-মন্ত্রী পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন। কসাক সেনাপতি কর্নিলফ জানালেন, সৈনিকদের মধ্যে নিয়মঅনুবর্তিতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে ; সুতরাং তিনি আর সেনাপতি পদে থাকতে চান না।

ব্যাপারগুরুতর দেখে কেরেনস্কি সমর বিভাগের ভার নিলেন এবং কর্নিলফকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করলেন। আগেই বলেছি যে, কেরেনস্কিই ছিলেন অস্থায়ী সরকারে একমাত্র সমাজতন্ত্রী মন্ত্রী। এবার তিনি মন্ত্রীসভায় তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে চাইলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে উপদেশ দিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সোভিয়েটগুলি থেকে অন্তত তিনজন প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করা দরকার। প্রধানমন্ত্রীও এই কথাই ভাবছিলেন। তিনি তাই কেরেনস্কির উপদেশ মেনে নিয়ে তিনজন সোভিয়েট প্রতিনিধিকে মন্ত্রীসভার গ্রহন করলেন। শুধু তাই নয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলিউকভকে তাঁর পদ হতে অপসারিত করে টেরেসেঙ্কোলেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করলেন। মিলিউকভকে দেওয়া

হলো শিক্ষা দপ্তরের ভার। মিলিউকভ এতে অসন্তুষ্ট হয়ে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলেন।

মন্ত্রীসভা পুর্নগঠনের পর কেরেনস্কির প্রভাব খুব বেড়ে গেল। এদিকে মিত্রপক্ষ থেকে বার বার অস্থায়ী সরকারের কাছে দাবি জানানো হতে লাগলো যে, রাশিয়া যদি জার্মানীর পূর্ব সীমান্ত আক্রমন না করে তাহলে জার্মানীর জয় অবশ্যম্ভাবী। মিত্রপক্ষের এই দাবির ফলে কেরেনস্কি পশ্চিম রণাঙ্গনের অবস্থা সরে-জমিনে তদন্ত করবার জন্যে নিজেই সীমান্তে গিয়ে হাজির হলেন।

সীমান্তে উপস্থিত হয়ে সৈনিকদের অবস্থা দেখে তিনি রীতিমত হতাশ হলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, সৈনিকরা আর সেনানীদের আদেশ পালন করছে না। তারা যথেচ্ছ ভাবে সভা-সমিতিতে মেতে উঠেছে। অন্য কেউ হলে এ অবস্থায় হাল ছেড়ে দিয়ে চলে আসতেন ; কিন্তু কেরেনস্কি হাল ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসার লোক ছিলেন না। তাঁর অসাধারণ বগ্মীতা ও বুদ্ধিমত্তার ফলে অচিরেই তিনি সৈনিকদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেন। সৈনিকদের মধ্যে তখন পুনরায় উৎসাহের সাড়া পরে গেল। রুশ-বাহিনী অষ্ট্রিয় বাহিনীকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমন করলো। তাদের এই আক্রমণের বেগ অষ্ট্রিয় বাহিনী রুখতে পারলো না। রুশ-বাহিনী একের পর এক শত্রু পক্ষের ঘাঁটি দখল করতে করতে এগিয়ে চললো।

কেরেনস্কি তখন খুশিমনে রাজধানীতে ফিরে এলেন!

লেনিনের কর্মতৎপরতা ঃ

এদিকে লেনিনও চুপচাপ বসে ছিলেন না। তিনিও কেরেনস্কির সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছিলেন। জুনমাসে তিনি নিখিল রাশিয়ার সোভিয়েট প্রতিনিধিদের এক কংগ্রেস আহ্বান করলেন। শ্রমিক পরিষদগুলির প্রতিনিধিদেরও এই কংগ্রেসে যোগদান করবার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হলো। পেট্রোগ্রাদেই কংগ্রেসের অধিবেশণ বসলো।

কংগ্রেসের এই অধিবেশণে অস্থায়ী সরকারের তীব্র সমালোচনা করে লেনিন

বললেন—"সমাজতন্ত্রী রাশিয়া, সরকারের যুদ্ধনীতি কিছুতেই মেনে নেবে না। আমাদের এখন প্রধান কাজ হবে, এই প্রতিক্রিয়াশীল সরকারকে উচ্ছেদ করে শ্রমিকদের কর্তৃত্বাধীনে নতুন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। বুর্জোয়া মনোভাবাপন্ন বলেই মন্ত্রীসভা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধনীতিকে আঁকড়ে ধরে আছে। সুতরাং অবিলম্বে এ সরকারের পতন ঘটাতে হবে।"

ওদিকে রণাঙ্গনের অবস্থা প্রথম দিকে রুশ বাহিনীর অনুকূলে থাকলেও শীগগিরই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। জার্মানরা তাদের সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশকে পূর্ব-রণাঙ্গণ থেকে সরিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে নিয়োজিত করার ফলেই পূর্ব-রণাঙ্গনে তাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজয় ঘঠেছিলো। কিন্তু তারা যখন নতুন করে সেনাবাহিনী পূর্ব-রণাঙ্গনে নিয়ে এসে রুশ-সৈনিকের উপর আক্রমণ চালালো তখন রুশবাহিনী সে আক্রমন প্রতিরোধ করতে পারলো না। জার্মান এবং অষ্ট্রীয় বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণে রুশ-বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

এই পরাজয়ের ফলে রুশ সৈনিকদের নৈতিক মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙে পড়লো। তারা তখন সেনাপতিদের আদেশ অমান্য করে ঘরে ফিরে আসতে লাগলো।

লেনিন এ সুযোগ পুরোপুরিভাবে গ্রহন করলেন। বলশেভিকদের তিনি নির্দেশ দিলেন, সীমান্ত প্রত্যাগত সৈনিকদের বিদ্রোহী মনোভাবকে আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। লেনিনের এই নির্দেশের ফলে বলশেভিকরা সৈনিকদের মধ্যে প্রচার শুরু করে দিলেন। এই প্রচার কার্যের ফলে যে সব সৈনিক আভ্যন্তরীন শান্তিরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলোতারাওবিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠলো।

এদিকে ট্রটস্কির নেতৃত্বে যে রেডগার্ড বাহিনী গঠিত হয়েছিলো তারা তখন প্রতিদিন পেট্রোগ্রাদের রাস্তায় রাস্তায় মার্চ করে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে শ্রমিক, ছাত্র ও জনগণের মিছিল। ওই সব মিছিল থেকে দাবি উঠছে—"অস্থায়ী সরকার নিপাত যাক।"

এই সময় পুটিলভ কারখানা হতে প্রায় ত্রিশ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট ঘোষণা করে পেট্রোগ্রাদে উপস্থিত হলো। তাদের সঙ্গে মিলিত হলো ক্রোনস্টোড্ হতে আগত প্রায় বিশ হাজার বিদ্রোহী সৈনিক। এই সশস্ত্র জনতা ডুমার সামনে এসে সমবেত হলো।

পেট্রোগ্রাদের যখন এই রকম অবস্থা ঠিক সেই সময় কেরেনস্কি সীমান্ত হতে ফিরে এলেন। রাজধানীতে এসেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাজধানীর অশান্তির জন্যে লেনিন এবং তার সহকর্মিরাই দায়ী। তিনি তখন লেনিন ট্রটস্কি, স্তালিন, জিনোভিভ প্রভৃতি বলশেভিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন। লেনিন ও জিনোভিভ এ খবর আগেই জানতে পেরে আত্মগোপন করলেন এবং গোপন পথে ফিনল্যাণ্ডে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ট্রটস্কি এবং আরও কয়েকজন নেতা ধরা পড়লেন। স্তালিন কিন্তু ধরাও পড়লেন না, রাশিয়া থেকে পালিয়েও গেলেন না। তিনি আত্মগোপন করে যথারীতি কাজকর্ম চালিয়ে যেতে লাগলেন।

দেশের এই রকম অবস্থা দেখে প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ভফ্ পদত্যাগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেরেনস্কি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করে মন্ত্রীসভার সংস্কারে মনোনিবেশ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, এখন হতে মন্ত্রীসভায় কোনো বিশেষ দলের প্রাধাণ্য থাকবে না। দেশে যে সব গণসংগঠন আছে তাদের প্রতিনিধিদের নিয়ে নতুন করে মন্ত্রীসভা গঠিত হবে।

কেরেনস্কি যে বুদ্ধিমান লোক ছিলেন তা তাঁর এই ঘোষণা হতেই বুঝতে পারা যায়। তাঁর এই ঘোষণার ফলে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন লোকেরা তাঁদের বিপ্লবী মনোভাব পরিত্যাগ করে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এলেন। এর ফলে সোভিয়েটগুলির মধ্যে বলশেভিকদের প্রাধাণ্য অনেকখানি কমে গেল।

মন্ত্রীসভা পুর্ণগঠন এবং গণ-পরিষদ গঠনের চেষ্টা ঃ

কেরেনস্কি তাঁর ঘোষণা অনুসারে মন্ত্রীসভাকে পুনর্গঠন করলেন। মন্ত্রীসভা

পুনর্গঠনের পর তিনি দেখতে পেলেন যে, বহুসংখ্যক বিপ্লবী নেতা তাঁকে সমর্থন করছেন। তাঁর তখন মনে হলো যে, তাঁর শক্তি আগের চেয়ে বেড়ে গেছে; এখন আর বলশেভিকরা তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না। এই কথা মনে হতেই তিনি ট্রটস্কি এবং অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের মুক্তি দিলেন।

কিন্তু এতো করেও কেরেনস্কি জনসাধারণকে খুশি করতে পারলেন না। জনসাধারণ গণ-পরিষদের দাবী তুললো। এ দাবী তুলবার কারণও ছিলো। বিপ্লব শুরু হবার সময় নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে একটি গণ-পরিষদ গঠন করা হবে। কেরেনস্কি তাই বাধ্য হয়েই এক ইস্তাহার মারফৎ ঘোষণা করলেন, গণ-পরিষদে কি কি বিষয় আলোচিত হবে তা স্থির করার জন্যে ২৬শে আগষ্ট মস্কোতে একটি জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হবে।

নির্দিষ্ট দিনে জাতীয় সম্মেলন শুরু হলো। কিন্তু প্রতিনিধিরা একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন না। প্রতিনিধিদের মধ্যে চরমপন্থী বলশেভিক এবং রক্ষণশীল বুর্জোয়ারা থাকার ফলেই ঐক্যমত সম্ভব হলো না। মাঝখান থেকে তিনি বিপ্লবীদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে পড়লেন। গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা গঠন করে তিনি যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন, জাতীয় সম্মেলনে জোড়াতালি দিতে গিয়ে তিনি তা হারালেন। এই সম্মেলনে তিনি যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে বিপ্লবীরা আর তাঁর ওপরে আস্থা রাখতে পারলেন না। তাঁরা তখন প্রকাশ্যেই বলতে লাগলেন যে, কেরেনস্কি বিপ্লব-বিরোধী; তাঁর দ্বারা দেশের কোনো উপকারই হবে না।

রণাঙ্গনের অবস্থা ঃ

জার্মানদের হাতে রুশ-বাহিনীর পরাজয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। বিজয়ী জার্মান-বাহিনী তখন পেট্রোগ্রাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জার্মান-বাহিনীর এই অগ্রগতির খবর পেয়ে কেরেনস্কি প্রেট্রোগ্রাদকে 'বিপন্ন নগরী' বলে ঘোষণা করলেন এবং রাজধানীকে সেখান থেকে মস্কোতে স্থানান্তরিত করবার অভিপ্রায়

ব্যক্ত করলেন। এর ফলে চারদিক হতে প্রতিবাদ শুরু হলো। ঠিক এই সময় জেনারেল কর্নিলফ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন। এর ফলে অবস্থা আরও জটিল হয়ে উঠলো।

কর্নিলফের বিদ্রোহ ঘোষণার কারণঃ

কর্নিলফ কেন হঠাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে বসলেন সে সম্বন্ধে জানতে হলে কিছু পূর্ব-ইতিহাস জানা দরকার। কর্নিলফ ছিলেন কসাক বাহিনীর সেনাপতি। তিনি নিজেও ছিলেন কসাক। তাই কসাক সৈনিকদের ওপরে তার প্রভাবও ছিল যথেষ্ট। এই সমরকুশলী সেনানায়ককে কেরেনস্কিই রাশিয়ার প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও কর্নিলফ কেরেনস্কিকে সহ্য করতে পারতেন না। তিনি মনে করতেন যে, কেরেনস্কি রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হবার অনুপযুক্ত। সুতরাং তিনি অনেক দিন আগে থেকেই সুযোগের সন্ধানে ছিলেন। এবার জার্মান-বাহিনী পেট্রোগ্রাদের দিকে অগ্রসর হওয়ায় এবং জাতীয় সম্মেলনের ব্যাপারে কেরেনস্কি জনসাধারণের অপ্রিয় হয়ে পড়ায় কর্নিলফ্ মনে করলেন, এই সুযোগেই তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেবেন।

কেরেনস্কির কর্মতৎপরতাঃ

কর্নিলফের মতলব বুঝতে কেরেনস্কির মোটেই দেরী হলো না। তিনি তাই অবিলম্বে মন্ত্রীসভার সামনে বিষয়টা উত্থাপণ করে কর্নিলফের পদচ্যুতি দাবি করলেন। মন্ত্রীসভাও তাঁর দাবি মেনে নিলেন। এর ফলে ১০ই সেপ্টেম্বর এক সরকারী ইস্তাহার জারী করে তাতে বলা হলো যে, বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে কর্নিলফকে পদচ্যুত করা হলো, সুতরাং সৈনিকরা যেন তাঁর আদেশ পালন না করে।

সরকারী ইস্তাহার ঘোষিত হবার পর কর্নিলফ তাঁর পরবর্তী কর্মপন্থা স্থির করে ফেললেন। তিনি তাঁর বিশ্বাসভাজন জেনারেল ক্রিমফ্‌কে কসাক বাহিনী নিয়ে অবিলম্বে রাজধানী আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন।

এদিকে কেরেনস্কিও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কর্নিলফ্ এবং ক্রিমফের আক্রমণ

প্রতিরোধ করবার জন্যে তিনি শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেন এবং নৌ-বাহিনীর সৈনিকদের রাজধানীতে আহ্বান করলেন।

জেনারেল ক্রিমফ কসাক বাহিনী নিয়ে পেট্রোগ্রাদে উপস্থিত হবার পর কসাকরা রাজধানী আক্রমন করতে অস্বীকার করলো। তারা বুঝতে পারলো যে, দুই শক্তিমান লোকের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সংঘাতের ফলে এক পক্ষ তাদের দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে সচেষ্ট হয়েছে। কসাক সৈনিকদের এই নিষ্ক্রিয়তার ফলে ক্রিমফ্ এবং কর্নিলফের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। ক্রিমফ্ পলায়ন করে গ্রেপ্তার এড়ালেন। কর্নিলক ধৃত হয়ে সামরিক আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

বলশেভিকদের প্রস্তুতি ঃ

কসাক বাহিনীকে রুখতে কেরেনস্কি শ্রমিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ায় বলশেভিকদের খুব সুবিধে হয়ে গেল। তাঁরা তখন বিপ্লবের জন্যে নতুন করে প্রস্তুত হতে লাগলেন। লেনিনও এ সময় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ফিনল্যাণ্ড হতে তিনি ট্রটস্কির কাছে এক জরুরী বার্তা পঠিয়ে বললেন, "যেভাবেই হোক সৈনিকদের হাত করতে হবে, অপনি অবিলম্বে এ কাজে হস্তক্ষেপ করুন।" লেনিনের নির্দেশ অনুসারে ট্রটস্কি অবিলম্বে সৈনিকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

শ্রমিক এবং কৃষকদের মধ্যেও বলশেভিকরা কাজ শুরু করলেন। এর ফলে চতুর্দিকে ধর্মঘট এবং দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে গেল। বিপ্লবীরা শ্রমিক এবং কৃষকদের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে রেল লাইন ভেঙে ফেললেন এবং অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করতে লাগলেন। সোভিয়েটগুলো হতেও বিরোধী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের বিতাড়ণের কাজ শুরু হলো। ১৮ই সেপ্টেম্বর পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েট হতে মেনশেভিকরা বিতাড়িত হলেন।

এই সময় মন্ত্রীসভার সামনে আর এক বিপদ এসে উপস্থিত হলো। এটা হলো দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া সারা রাশিয়ার বুকে ছড়িয়ে পড়লো।

এই সব প্রতিকূল ঘটনায় কেরেনস্কি রীতিমত হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি তখন শেষ রক্ষার জন্যে সোভিয়েট প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে, সোভিয়েটগুলি থেকে কিছু-সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করলেই বিপদ কেটে যাবে। কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হলো না। সোভিয়েটগুলিতে তখন বলশেভিকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার ফলেই কেরেনস্কির চাল ভেস্তে গেল।

এই সময় বলশেভিক দল ঘোষণা করলো যে, নভেম্বর মাসে সোভিয়েটগুলির এক মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। পক্ষান্তরে কেরেনস্কি-সরকার ঘোষণা করলো, ২৫শে ডিসেম্বর গণ-পরিষদের অধিবেশন হবে। কেরেনস্কি ভাবলেন, এই চালেই তিনি মাত করবেন। কিন্তু লেনিনের জন্যে তা হতে পারলো না।

লেনিনের ঐতিহাসিক নির্দেশ ঃ

লেনিন তখন রাশিয়ায় না থাকলেও সেখানকার সব খবরই রাখতেন। তিনি যখন শুনতে গেলেন যে, কেরেনস্কি গণ-পরিষদ বসিয়ে জনগণের বিপ্লবী মনো-ভাবের ওপর ছাই-চাপা দেবার ব্যবস্থা করছেন তখনই তিনি তাঁর সহকর্মীদের কাছে এক জরুরী নির্দেশ পাঠিয়ে অবিলম্বে ক্ষমতা দখল করতে বললেন। তিনি লিখলেন—"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্ষমতা দখল করা দরকার, নচেৎ সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আমরা যদি এখনই ক্ষমতা দখল না করি তাহলে ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের জন্যে অপেক্ষা করা নিরর্থক ঃ কোনো বিপ্লবই এর জন্যে অপেক্ষা করে না। আমরা যে জয়ী হবো এতে কোনোই সন্দেহ নেই।"

(It is necessary to seize power as soon as possible, otherwise it will be too late. History will never forgive us if we do not seize power now. To wait for a formal majority is naive : No Revolvtion ever waits for this. We shall come out victorious without a doubt.")

লেনিনের এই নির্দেশ-পত্র হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক নেতারা এক

গোপন সভায় মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ২৮শে অক্টোবর বিপ্লব শুরু করা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটলো যার ফলে বিপ্লব শুরু করার তারিখ পিছিয়ে দেবার দরকার হলো।

প্রতিকূল ঘটনাবলী ঃ

২৩ শে অক্টোবর খবর পাওয়া গেল, জার্মান নৌ-বহর রিগা উপসাগরে প্রবেশ করেছে। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে কোরেনস্কি পেট্রোগ্রাদের নাগরিকদের শহর পরিত্যগের আদেশ দিলেন। এই আদেশেকে বলশেভিকরা বিশ্বাসঘাতকতা বলে বর্ণনা করে, তাঁদের পত্রিকাগুলিতে কেরেনস্কি এবং তাঁর সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমন করতে লাগলেন। পত্রিকাগুলিতে লেখা হলো, অস্থায়ী-সরকার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আসন্ন বিপ্লবকে দুর্বল করে দেবার জন্যেই ওরা পেট্রোগ্রাদকে শত্রুর হাতে তুলে দেবার মতলব করেছে। রিগা ইতিমধ্যেই জার্মানীর কাছে বিক্রি করা হয়েছে, এবার পেট্রোগ্রাদকে বিক্রি করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

এই ধরণের আরও অনেক কথা পত্রিকাগুলিতে প্রচারিত হতে লাগলো।

কর্মব্যস্ত লেনিন ঃ

লেনিনের মনে হলো যে, এ সময় তাঁর পেট্রোগ্রাদে উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। তিনি তাই আর এক মুহূর্ত দেরী না করে পেট্রোগ্রাদে চলে এলেন। যেদিন তিনি পেট্রোগ্রাদে এলেন সেই রাত্রেই বলশেভিক নেতারা এক গোপন সভায় মিলিত হলেন। সে সভায় লেলিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, জিনেভিভ্ এবং আরও অনেক প্রথম সারির নেতা উপস্থিত ছিলেন। নেতাদের মধ্যে সারা রাত ধরে আলোচনা চলে। পরদিন সকালে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেন যে, অবিলম্বে বিপ্লব শুরু করতে হবে এবং ট্রটস্কি এই বিগ্লব পরিচালনা করবেন। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবার পরেই লেনিন আবার তাঁর গোপন আশ্রয়ে ফিরে গেলেন।

২৬শে অক্টোবর পেট্রোগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যনির্বাহক কমিটি সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সমগ্র পেট্রোগ্রাদ কমিটি এবং রেজি-

মেণ্টাল কমিটি এই নবগঠিত সামরিক বিপ্লবী কমিটির নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়। ইতিপূর্বে স্তালিন, স্কার্ডলভ, ঝারঝিলস্কি এবং আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কমরেডদের নিয়ে একটি সামরিক বিপ্লবী কেন্দ্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো। সেই কেন্দ্রের সদস্যরা সকলেই নবগঠিত বিপ্লবী কমিটির সদস্য হন।

৫ই নভেম্বর সামরিক বিপ্লবী কমিটি বিভিন্ন সামরিক ইউনিট-এ কমিশার নিয়োগ করে।

এদিকে কেরেনস্কির সাময়িক সরকার তখন মরিয়া হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা স্থির করে, ৬ই নভেম্বর সামরিক বিপ্লবী কমিটির সদস্যদের ও কমিশারদের গ্রেপ্তার করতে হবে। তারা বলশেভিকদের সংবাদ পত্র 'সালদাৎ' এবং 'রাবোচি পুত' বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ইতিহাসের চাকা তখন বিপরীত দিকে ঘুরছে। জনগণ কেরেনস্কি সরকারকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করবার জন্যে কৃতসংকল্প হয়েছে।

লেনিন কিন্তু তখনও তাঁর গোপন আশ্রয় স্থলে আত্মগোপন করে আছেন। বিপ্লব শুরু হতে চলেছে অথচ এখনও তিনি বিপ্লবী কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারছেন না, তিনি তাই সব সময় ছটফট করছেন। ৬ই নভেম্বর সন্ধ্যার সময় একজন ফিন কমরেড এসে খবর দিলেন যে, সাময়িক সরকার নগর রক্ষীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দ্বিগুণ করেছে এবং শ্রমিক অধ্যুষিত অঞ্চল ভিবুর্গ ও পেট্রোগ্রাদের মধ্যে নেভা নদীর ওপরে যে সেতুগুলি আছে সেগুলোর মুখে সৈন্য মোতায়েন করেছে।

এই খবর শুনে লেনিন অবিলম্বে স্তালিনকে তাঁর কাছে চলে আসবার কথা বলেন। কিন্তু ফিন কমরেডের পক্ষে তাঁর নির্দেশ মতো কাজ করা সম্ভব হয় না, কারণ স্তালিনের কাছে যাবার সব পথই তখন রুদ্ধ। লেনিন জানতেন যে, স্তালিন এবং বিপ্লবী কমিটির সদস্যরা রয়েছেন স্মোলনি ইনষ্টিটিউট-এ। লেনিন তখন আর কালবিলম্ব না করে স্মোলনি ইনষ্টিটিউট-এ যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর সহকর্মীরা যখন বিপ্লব শুরু করতে যাচ্ছেন তখন বিপ্লবের হোতা

হয়ে তিনি কি আত্মগোপন করে থাকতে পারেন? তাই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে লেনিন উপস্থিত হলেন স্মোলনিতে—তাঁর সহকর্মীদের কাছে।

(এখানে স্মোলনি ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে কিছু বলার দরকার বোধ করছি। এক সময় ওটা ছিল অভিজাত ঘরের মেয়েদের শিক্ষার জন্যে একটি বিখ্যাত বিদ্যামন্দির ও মঠ। এই মঠ-বিদ্যামন্দিরটি তখন পরিচালিত হতো জারিনার পৃষ্ঠপোষকতায়। পরবর্তীকালে বিপ্লবীরা এই ইনষ্টিটিউট-টি দখল করে নিয়ে ওখানে বিপ্লবী কমিটির সদরদপ্তর স্থাপন করেন।)

৭ই নভেম্বর। সকাল থেকেই বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পরে স্মোলনি ইনষ্টিটিউট-এর হলঘরে দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হলো। পুরোনো কার্যনির্বাহক কমিটির নেতারা মঞ্চের ওপরে আসন গ্রহন করলেন। তাঁদের মধ্যে তিনজন সেদিন অনুপস্থিত। এরা হলেন কেরেনস্কি, চ্খেইদ্জে এবং সেরেতেলি। ইতিহাসের কী নির্মম পরিহাস! মাত্র আট মাস আগেও এঁরা ছিলেন মহাবিপ্লবী, আর আজ এঁরা নিক্ষিপ্ত হয়েছেন ইতিহাসের আবর্জনা স্তূপে।

নতুন সভাপতিমণ্ডলী নির্বাচিত হলো। তাতে স্থান পেলেন ট্রটস্কি, কামেনেভ্, আলেকজান্দার কোলোনটাই, নোগিন প্রমুখ নেতারা, অথচ মাত্র চার মাস আগেও এঁদের পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছিলো।

আলোচনা শুরু হলো। হঠাৎ শোনা গেল কামানের বজ্র নির্ঘোষ। নেভা নদীর ওপরে 'অরোরা' ক্রুজার থেকে সাময়িক সরকারের সদর দপ্তরের ওপর বর্ষিত কামাদের সেই বজ্র-নির্ঘোষ ঘোষণা করছে শোষণ-মুক্তির স্বর্ণউষা। যুগ যুগ ধরে রাশিয়ার জনগণ যে স্বপ্ন দেখে আসছিলেন সে স্বপ্ন আজ সফল হতে চলেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মৃত্যু-ঘণ্টা বাজছে।

* * *

সাময়িক সরকারের পতন ঘটেছে। সামরিক বিপ্লবী কমিটি প্রাসাদ দখল করেছে। কেরেনস্কি পালিয়ে গেছেন। এখন তিনি চেষ্টা করছেন ইংরেজ ও ফরাসীদের সাহায্যে প্রতিবিপ্লব সংগঠিত করতে।

৮ই নভেম্বর সকালে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে সবই শান্ত। কিন্তু ক্যাডেট, সোস্যালিস্ট রেভোলিউশনারী, মেনশেভিক প্রভৃতি দলের মুখপাত্ররা লেনিন ও বলশেভিক নেতাদের মুণ্ডপাত করছে।

রাত ঠিক ৮টা ৪০ মিনিটে সভাপতিমণ্ডলী প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল করতালি ধ্বনি। তাঁদের মধ্যে লেনিনও আছেন। তাঁর পরনে জীর্ণ পোশাক, ট্রাউজারটা বেঢপ, মুখে খোচা খোচা দাড়ি। বক্তৃতা মঞ্চের এক ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছেন সমবেত জনতাকে।

করতালি ধ্বনি থামলে এগিয়ে এলেন লেনিন। সমবেত জনতার দিকে তাকিয়ে ধীর স্থির কণ্ঠে ঘোষণা করলেন শান্তির বাণী। সমস্ত যুদ্ধমান জাতি ও সরকারের উদ্দেশে ঘোষিত হলো—"রাশিয়ার জনগণ যুদ্ধ চান না। তাঁরা চান শান্তি।"

কামেনভ এই ঘোষণাবাণীর সমর্থকদের হাত তুলেতে বললেন। সবাই এক সঙ্গে হাত তুললেন। হাত না তোলা লোকের সংখ্যা ছিলো মাত্র একটি। কিন্তু তার চারপাশের লোকেরা এমন গর্জণ করে উঠলো যে, তাড়াতাড়ি সে হাত তুলে ফেললো। ঘোষণা বাণী সর্ববাদীসমস্তভাবে গৃহীত হলো।

শান্তির ঘোষণার পরেই ভূমির ঘোষণা। তারপর সরকার গঠনের ঘোষোণা। ঘোষিত হলো যে, বর্তমানে শাসন চালাবে শ্রমিক ও কৃষকদের সরকারের পক্ষে কমিশার পরিষদ। পরিষদের সদস্যদের নামও ঘোষিত হলো। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হলো পরিষদ।

সভাপতি—ভ্লাদিমির উলিয়ানভ (লেনিন), স্বরাষ্ট্র—এ. ওয়াই. রাইকভ। কৃষি—ভি. পি. মিলিউটিন; শ্রম—এ. জি. শ্লিয়াপানিকভ্; সামরিক ও সামুদ্রিক—ভি. এ. ওভমিয়েঙ্কো; এল. ভি. ক্রাইলেস্কা, পি. এম. ডাইবেঙ্কো। বানিজ্য ও শিল্প—ভি. পি. নোগিন; শিক্ষা—এ. ভি. লুনাচারস্কি; অর্থ—ওয়াই ওয়াই স্ক্‌ভংসভ্ (স্তপানভ্); পররাষ্ট্র—এল. ভি. ব্রনষ্টিন (ট্রটস্কি); বিচার—জি. ওয়াই. ওপ্লোকভ; সরবরাহ—ওয়াই. এ. টিয়োভোরোভিচ; ডাক

ও তার—এল. পি. আভিলড (গ্রেবভ); জাতিসত্তা দপ্তরের সভাপতি—জে. ভি. স্তালিন।

কেরেনস্কির শেষ চেষ্টা ঃ

বিপ্লবের আগেই কেরেনস্কি বুঝতে পেরেছিলেন যে, বলশেভিকরা আবার বিপ্লবের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। তিনি তাই আসন্ন বিপ্লবকে অঙ্কুরেই বিনাশ করবার জন্যে কসাক বাহিনীর স্মরণাপন্ন হন। কসাকরা কিন্তু তাঁকে নিরাশ করে। কর্নিলফের প্রাণদণ্ডের পর থেকেই কসাকরা কেরেনস্কির ওপরে বিরূপ হয়ে ছিলো। তারা ভুলতে পারেনি যে, কর্নিলফও কসাক ছিলেন এবং কেরেনস্কির আদেশেই তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছিলো। এছাড়া ট্রটস্কি এবং বলশেভিক নেতাদের তারা আপনজন বলে মনে করতো। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, বলশেভিকরাই প্রকৃত দেশপ্রেমিক। এইসব কারণেই কেরেনস্কিকে তারা আমল দেয় নি।

বিপদ দেখে কেরনস্কি তখন সীমান্তের সৈনিকদের সাহায্যে বিপ্লবীদের দমন করবেন বলে স্থির করেন। তাঁর মনে একটা ভ্রান্ত ধারনা ছিলো যে. পেট্রোগ্রাদের বাইরে যে সব সৈনিক রয়েছে তাদের ওপরে বলশেভিকদের কোনো প্রভাব নেই। তিনি তাই মার্কিন রাজদূতের সাহায্যে তাঁরই গাড়িতে সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করেন। কেরেনস্কি আশা করেছিলেন যে, সীমান্তের সেনা-বাহিনী নিশ্চয়ই তাঁকে সাহায্য করবে। কিন্তু সেখানে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেনানীরা তাঁকে সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন যে, তাঁকে আর তাঁরা রাষ্ট্র-প্রধান বলে মনে করেন না। সেনানীরা তাঁকে আরও জানান যে, তাঁরা এখন বলশেভিকদের আনুগত্য স্বীকার করেছেন। তাঁরা আরও জানালেন, সীমান্তে তাঁর উপস্থিতি আদৌ বাঞ্চনীয় নয়, কারণ তাতে রুশ-বাহিনীর গতিবিধি ব্যহত হতে পারে।

সেনানীদের মুখ থেকে এই কথা শুনবার পরেও কেরেনস্কি আশা ছাড়লেন না। তিনি সৈনিকদের কাছে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু সেনানীরা তাঁকে সে সুযোগ দিলেন না। তাঁরা তাঁকে বন্দী করলেন। কিন্তু

তাঁর এই বন্দী দশা বেশি দিন স্থায়ী হলো না। তাঁকে যেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো সেখানকার একজন রক্ষী-সৈনিকের সাহায্যে তিনি পলায়ন করেন।

পালিয়ে যাবার পর তিনি প্রথমে প্যারীতে এবং সেখান থেকে নিউইয়র্কে চলে যান। এখানেই তাঁর রাজনৈতিক-জীবনের পরিসমাপ্তি হলো।

গণ-বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলো ঃ

কেরেনস্কি যেদিন পেট্রোগ্রাদ থেকে সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করেন সেইদিনই (৭ই নভেম্বর) লেনিন অত্মপ্রকাশ করলেন এবং অবিলম্বে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করবার জন্যে রেডগার্ডদের অধ্যক্ষ ট্রটস্কিকে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রেড-গার্ডরা বেরিয়ে পড়লো। তাদের সঙ্গে যোগ দিলো সশস্ত্র শ্রমিকদল এবং রণ-দুর্মদ কসাক বাহিনী।

তখনও কিছুসংখ্যক সৈনিক অস্থায়ী সরকারের পক্ষে ছিলো। কিন্তু বলশেভিকদের প্রচণ্ড আক্রমনে তারা ঝড়ের মুখে তৃণখণ্ডের মতো উড়ে গেল।

নভেম্বর-বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হলো। রাশিয়ার ইতিহাসে ৭ই নভেম্বর চিরদিনের জন্যে চিহ্নিত হয়ে রইলো।

রশিয়ার-গণ বিপ্লবে স্তালিনের অবদান ঃ

ইতিপূর্বে আমরা লেনিন, ট্রটস্কি এবং আরও কয়েকজন বলশেভিক নেতা সম্বন্ধে আলোচনা করলেও স্তালিন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিনি। নভেম্বর বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবারপূর্বে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের যে শাখাটি গুপ্তভাবে কাজ করছিলো, স্তালিন ছিলেন সেই শাখার নেতৃত্বে। অর্থাৎ বিপ্লবের কোলাহলের পেছনে যে বিরাট সংগঠন শক্তি গণ-বিপ্লবকে সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে চালিত করছিলো সেখানে এই আত্মপ্রচার-বিমুখ এশিয় তাতারের সুদৃঢ় সংগঠন-শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিলো।

স্তালিন ছিলেন লেনিন ও ট্রটস্কির একান্ত বিশ্বাসভাজন সহকারী। যখনই তাঁরা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কোথাও গেছেন তখনই তাঁরা স্তালিনকে সঙ্গে নিয়েছেন।

নভেম্বর বিপ্লবের পরে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যখন নবজাগ্রত রাশিয়াকে চারদিক থেকে আক্রমণ করে পিষে ফেলতে চেষ্টা করে, সেই দুর্দিনে আমরা স্তালিনকে দেখতে পাই লাল-ফৌজের সঙ্গে। পূর্ব এশিয়ায় জাপানী সেনাবাহিনীর এবং পশ্চিম সীমান্তে ইঙ্গ-ফরাসী সম্মিলিত বাহিনীর প্রতিরোধে স্তালিনকে দেখতে পাওয়া যায় প্রথম সারির নেতা হিসেবে।

রুশ-বিপ্লবে লেনিনের অবদান সর্বজন স্বীকৃত ; কিন্তু তাঁর অবদানের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো স্তালিনের কর্মশক্তি, বীরত্ব এবং সামরিক প্রতিভা। আজ U. S. S. R. নামে যে ঐক্যবদ্ধ এবং সংযুক্ত রাশিয়াকে দেখতে পাই তাও স্তালিনের চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিলো। নভেম্বর বিপ্লবের পরে বলশেভিক দল যখন দেশের শাসনভার গ্রহন করে তখন রাশিয়ার রাষ্ট্রতন্ত্রের নাম দেওয়া হয় Rusian Soviet Federated Socialist Republic (R. S. F. S. R)। বলশেভিক দল ঘোষণা করে, এই ফেডারেল-এ যোগদান করবার জন্যে কোনো অঞ্চলকে বাধ্য করা হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশের ঐক্য ও সংহতির কথা বিবেচনা করে স্তালিন রাশিয়াকে নতুনভাবে রূপ দান করেন। সেই নব রূপই হলো বর্তমান U. S. S. R. (Union of Sovitet Socialist Republic.)

নতুন রাশিয়ার গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত স্তালিনকে আমরা নানাভাবে দেখতে পাই। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে সে সব কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে বিবেচনা করে স্তালিন সম্বন্ধে এখানেই আমাদের আলোচনা শেষ করছি।

শেষ কথা ঃ

নভেম্বর বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হবার পর লেনিন রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে মনোনিবেশ করেন। প্রথমেই প্রতিক্রিয়াশীল মেনশেভিক নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়। সেনাবাহিনীর ভার দেওয়া হয় ট্রটস্কির ওপর। এর পরেই ঘোষণা করা হয়। "এখন থেকে দেশের সমস্ত জমি জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে, ব্যাঙ্ক ও কল-

কারখানাগুলো রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে ; গীর্জার সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি গীর্জার আওতায় না থেকে সরকারের নির্দেশ অনুসারে চলবে।"

পরের বছর (১৯১৮) বলশেভিক দলকে নিখিল রুশীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করা হয়। এই বছরই মার্চ মাসে জার্মানীর সঙ্গে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে নবগঠিত রুশ সরকার যুদ্ধের অবসান ঘটান। এই সন্ধির বিরুদ্ধে মিত্র-শক্তির পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি ওঠে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া তাদের সেই আপত্তিতে কর্ণপাত করে না। এর ফলে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান এক জোট হয়ে উত্তর রাশিয়া, দক্ষিণ রাশিয়া এবং সাইবেরিয়া আক্রমণ করে। রাশিয়ায় যেসব প্রতিক্রিয়াশীল দল তখনও বিদ্যমান ছিলো তারাও এই সুযোগে তৎপর হয়ে ওঠে। তারা 'হোয়াইট গার্ড' নামে এক সেনাবাহিনী গঠন করে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে। কিন্তু ট্রটস্কি ও স্তালিনের সুযোগ্য পরিচালনায় রাশিয়ার রেডগার্ড বাহিনী এই সব আক্রমণ-কারীদের পরাজিত করে বাল্টিক সাগর হতে বেরিং প্রণালী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে নবগঠিত রাষ্ট্রের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

আক্রমণকারীদের পরাস্ত করলেও সরকার আর এক বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়। জারের সিংহাসন ত্যাগের পরেই ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলো। এরপর পোল্যাণ্ড ও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এছাড়া বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী এস্তোনিয়া, লাটাভিয়া, লিথুয়ানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলগুলিও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এদিকে রুমানিয়া, বেসারেবিয়া দখল করে নেয় এবং শ্বেত রাশিয়া, ইউক্রেন এবং ককেশাস অঞ্চলের উপজাতিগুলি বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় রাশিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্রভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

এইসব ব্যাপার দেখে রুশ সরকার রীতিমত চিন্তিত হয়ে ওঠে। কিন্তু লেনিন এবং তাঁর সহকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যায়।

জার এবং জারিনার কি হলো :

রাশিয়ার ভূতপূর্ব জার নিকোলাস এবং তাঁর পত্নীর (অর্থাৎ ভূতপূর্ব জারিনার) কি হলো সেই কথা বলেই আমরা আমাদের বক্তব্য শেষ করবো। আগেই বলেছি যে, মার্চ বিপ্লবের সময় জার এবং জারিনাকে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিলো। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও তাঁদের কাছেই ছিলো। কিন্তু তাদের ভাগ্যে কি ঘটলো সে সম্বন্ধে ইতিহাস একেবারেই নীরব। তবে পরবর্তীকালের কতকগুলি সংবাদ এবং আলোচনা পড়ে আমাদের মনে হয় যে, রাশিয়ার রাজবংশ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই রাজবংশের প্রভাব দেশের ভেতরে (এবং বাইরেও) উপেক্ষণীয় ছিলো না। রাজবংশকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের শত্রুরা আবার হয়তো মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে মনে করেই বিপ্লবীরা রাজবংশকে সমূলে ধ্বংস করেছেন বলে মনে হয়।

পরিশিষ্ট

প্রাক্-বিপ্লবকালে রাশিয়ার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল

উদারপন্থী দল (Liberal Party) :

এই দল রাজতন্ত্রের বিরোধী ছিলো না। এরা চাইতো, রাশিয়ার জারের ক্ষমতা ইংল্যাণ্ডের রাজার মতো আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ করা হোক। রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে এই দলের মতবাদ ছিলো, বৈধ উপায়ে দেশের ও দশের দুর্গতির কথা জারের গোচরে আনা। এরা বিশ্বাস করতো যে, বৈধ উপায়েই দেশের ও দশের উন্নতি করা সম্ভব। এই দলের অপর নাম 'নারোদবাদী দল'।

সমাজ-গণতান্ত্রিক দল (Social Democrat Party) :

এই পার্টির সদস্যরা কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতেন। মালিক শ্রেণীর দুর্নীতি ও দোষ ত্রুটির বিরুদ্ধে আন্দোলন করাই ছিলো এই পার্টির মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পার্টিই সর্বপ্রথম রাশিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করেছিলো।

সমাজ-বিপ্লবী দল (Social Revolutionary Party) :

উদারপন্থীদের মধ্যে যাঁরা কিছুটা চরম অভিমত পোষণ করতেন তারাই এই দলটি গঠন করেছিলেন। তাঁদের মতামত ছিলো, আইন সঙ্গত অথবা আইন বিরোধী, যে পন্থায়ই হোক কৃষকদের রাজনীতিতে সচেতন করে তুলতে হবে। এই দল সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী ছিলো।

সমাজতান্ত্রিক দল (Socialist Party) ঃ

এই দলের মতামত ছিলো, রাশিয়ায় রাষ্ট্রিয় সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং রাষ্ট্রই সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করবে। শ্রমিকদের একনায়কতন্ত্র এরাই প্রথমে বলে। এদের মতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিলো সমাজের অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর অঙ্গ। সুতরাং একে পরিত্যাগ করতে হবে। এরা আরও বলতো যে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না এবং সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের কোনো স্থান থাকবে না।

নৈরাজ্যবাদী দল (Anarchist Party) ঃ

এই দলের কার্যকলাপ সমাজতান্ত্রিক দলের কর্যকলাপ হতে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। এরা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলো। এদের বক্তব্য ছিলো, মানুষকে রাষ্ট্রের বন্ধন, সামাজিক বন্ধন, অর্থনৈতিক বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন হতে মুক্ত হতে হবে।

শূন্যপন্থী দল (Nihilists Party) ঃ

নিহিলিস্টদের আদর্শ যে কি ছিলো তার কোনো সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। কারো কারো মতে, নিহিলিস্টরা কোনো নিয়ম নীতির ধার ধারে না এবং কারো কাছে মাথা নত করে না। আবার কেউ কেউ এমন কথাও বলতেন যে নৈরাজ্যবাদের চরম অবস্থাই হলো নিহিলিজম।

উপরোক্ত দলগুলির প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আদর্শ ছিলো। কিন্তু এগুলি বাদে একটি আদর্শহীন দলও ছিলো। এদের বলা হতো সন্ত্রাশবাদী দল (Terrorists)।

সন্ত্রাসবাদী দল (Terrorists) ঃ

সন্ত্রাশবাদীদের বিষেষ কোনো আদর্শ ছিলো না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের শৈশব অবস্থায় বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সন্ত্রাশবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শাসক শ্রেণীর চণ্ডনীতির খড়্গ যখন জনগণের মাথার ওপরে ঝুলতে থাকে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে যেখানে কিছু থাকে না, সেখানেই এক শ্রেণীর উগ্রপন্থী যুবক 'মারের বদলে মার' নীতির পন্থা গ্রহণ করে। (আমাদের দেশেও এটা দেখা গেছে—লেখক)। প্রাক্ বিপ্লবকালে জারের চোখে এরাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে প্রতিভাত হয়েছিলো।